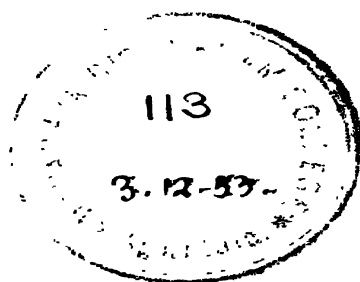
বাংলাভাষা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৯৩৮
পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৫৬

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে



ভূমিকা

ছাত্রপাঠকদের প্রতি

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতিমুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর-এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এসেছে তারই প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ-আয়ু শহরবাসী ইংরেজরাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রঙ মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজও আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদিজন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল—শৌরসেনী

ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, ওড়িয়া; গৌড়ী, বাংলা। আসামীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতি-প্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই-সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই বললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্ন্‌লে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশ অধিকার করেছিল। হর্ন্‌লের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতিদূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝরে ঝরে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়, তেমনি এই দূরকালের মাগধী ভাষা আর্য জন-সাধারণের বাণীধারায় বয়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হল না তার প্রকাশলীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে; গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূরকালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতি-পুরাতন এবং এই অতি-আধুনিক বাক্যস্রোত, এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হয়ে আছি। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার

নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধরে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে, আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার ভালো কৈফিয়ত সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে-সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও করে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো-চারটে খুঁত বেরোবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা-পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের, এমন-কি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।

বাংলাভাষা-পরিচয়

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তার পরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্যব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর-একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনও পাকা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হতে পারবে। এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারও কারও অভ্যস্ত নয়। সুতরাং ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে।

শান্তিনিকেতন
৭ কার্তিক, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাভাষা-পরিচয়

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীব-রঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্রয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বহ হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জন্তু মানুষের শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জন্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্ছাকে জন্মকাল থেকে মানুষের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসন্তান মানুষই হয় না, অথচ তখন তার জন্তু হতে বাধা নেই। এর কারণ বহু যুগের

বহু কোটি লোকের দেহ মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।

এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষপরম্পরায় মিলে এক-একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে।

এদের চেহারার একটা বিশেষত্ব আছে। এদের মনের গড়নটাও কিছু বিশেষ ধরনের। এই বিশেষত্বের লক্ষণ অনুসারে দলের লোক পরস্পরকে বিশেষ আত্মীয় বলে অনুভব করে। মানুষ আপনাকে সত্য বলে পায় এই আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা বহুদূরব্যাপী বৃহৎ ঐক্যজালে।

মানুষকে মানুষ করে তোলবার ভার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেইজন্যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিশ্লিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিশ্লিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা, তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব এইজন্যে শিশুকাল থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রধান শিক্ষা—পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা। যেখানে তার মধ্যে জন্তুর ধর্ম প্রবল সেখানে স্বেচ্ছা এবং স্বার্থের টানে তাকে স্বতন্ত্র করে, ভালোমতো মিলতে দেয় বাধা; তখন সমষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা, যে শিক্ষা, যে প্রবর্তনা দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে সে জোর ক'রে বলে, 'তোমাকে মানুষ হতে হবে কষ্ট ক'রে; তোমার জন্তুধর্মের উল্টো পথে গিয়ে।' জাতিক সত্তার

অন্তর্গত প্রত্যেকের মধ্যে নিয়ত এই ক্রিয়া চলছে ব'লে একটা বৃহৎ সীমানার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসংঘ তৈরি হয়ে উঠছে। একটা বিশেষ জাতিক নামের ঐক্যে তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ আচরণ নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাশা করতে পারে। মানুষ জন্মায় জন্তু হয়ে, কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

এই-যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের প্রেরয়িতা, তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত—প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হত কলের পুতুলের মতো; সেই-সব যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসরগতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।

জ্যোতিষ্কনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র্য আছে; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই

প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে। আবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি—যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অনুভব করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি য়িহুদি পুরাণে বলেছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য; যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ্‌দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন—

> আমি রাষ্ট্রী। আমার উপাসকদের আমি ধনসমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।
>
> প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়।
>
> আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টি-কর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি।

২

কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট, তার পরে চুনসুর্‌কির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি 'কথা'। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।

মাটির তাল নিয়ে চাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুমোর গ'ড়ে তোলে

হাঁড়িকুঁড়ি, নানা খেলনা, নানা মূর্তি। মানুষ সেইরকম গলার আওয়াজটাকে ঠোঁটে দাঁতে জিভে টাকরায় নাকের গর্তে ঘুরিয়ে ধ্বনির পুঞ্জ গড়ে তুলেছে; মানুষের মনের ঝোঁক, হৃদয়ের আবেগ সেইগুলোকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে নানা আকার দিচ্ছে।

দোয়েল-কোকিলরাও ধ্বনি দিয়ে ভাব প্রকাশ করে। মানুষের ভাষার ধ্বনি তেমন সহজ নয়। মানুষের অন্য নানা আচরণের মতো প্রত্যেক শিশুকে নতুন ক'রে শুরু করতে হয়েছে ভাষার অভ্যেস, জাগিয়ে রাখতে হয়েছে এর কৌশল। সেইজন্যে মানুষের ভাষা বাঁধা পড়ে যায় না একই অচল ঠাটে।

আস্তে আস্তে বদল তার চলেইছে, দু-তিন শো বছর আগেকার ভাষার সঙ্গে পরের ভাষার তফাত ঘটে আসছেই। তবু বিশেষ জাতের ভাষার মূল স্বভাবটা থেকে যায়, কেবল তার আচারের কিছু কিছু বদল হয়ে চলে। সেইজন্যেই প্রাচীন বাংলাভাষা বদল হতে হতে আধুনিক বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে, অমিল আছে যথেষ্ট, তবু তার স্বভাবের কাঠামোটাকে নিয়ে আছে তার ঐক্য।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার ক'রে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সমস্ত শব্দেরই এক-একটা মূল ধাতু আন্দাজ করা হয়েছে। সব আন্দাজগুলিই সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক, এর গোড়াকার তত্ত্বটাকে মানি। প্রাণজগতে প্রাণীসৃষ্টির আরম্ভে দেখা দেয় একটি একটি ক'রে জীবকোষ, তার পরে তাদেরই সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব। এক-একটি জীব এক-একটি বিশেষ কাঠামো নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অনুসরণ করে। জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।

ভারতবর্ষের কতকগুলি বিশেষ ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানী গৌড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন। আমি বাঙালি, মারাঠি

ভাষা শুনলে তার অর্থ বুঝতে পারি নে; কিন্তু দুটো ভাষাই যে এক জাতের, ভাষাবিজ্ঞানীরা সেটা ধরতে পেরেছেন তাদের কাঠামো থেকে। পুষ্‌তু ভাষায় কথা কয় পাঠানেরা, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমানা পেরিয়ে; পূর্ব সীমানায় আমরা বলি বাংলা। কিন্তু দুই ভাষারই কঙ্কাল-সংস্থানের মধ্যে যে ঐক্য আছে তার থেকে বোঝা যায় এরা আত্মীয়। এই দুই ভাষাতেই বহুসংখ্যক ধ্বনি গড়ে উঠেছে শব্দ হয়ে। একটা মূলস্বভাব তাদের ঐক্য দিয়েছে। শব্দগুলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে সেই স্বভাবটা ধরা পড়ে। এর থেকে বোঝা যায়, এক-এক জাতির ভাষা তার স্বতন্ত্র খেয়ালের সৃষ্টি নয়। কতকগুলি মূল ধ্বনিসংকেত নিয়ে যারা ভাষার কারবার আরম্ভ করেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে। কিন্তু ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়তা ধরা পড়ে তাঁদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে। প্রাচীন যুগের ঘোড়া আর এখনকার ঘোড়ায় প্রভেদ আছে বিস্তর, কিন্তু তাদের কঙ্কালের ছাঁদ দেখলে বোঝা যায়, তারা এক বংশের। ভাষার মধ্যেও সেই কঙ্কালের ছাঁদের মিল পেলেই তাদের একজাতীয়তা ধরা পড়ে।

ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিগত কোনো মানুষের বা দলের কৃত কার্য হত তা হলে তাকে বানানো বলতুম; কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূলপ্রকৃতিও তেমনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারায় তফাত আছে, এও তেমনি। বাগ্‌যন্ত্রের একটা-কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণ ঘটবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তার পরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার

ধরন ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা ক'রে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে, তার পরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেই-সব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে। পথহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন একজন বা দু-চারজন মানুষ কোনো-এক সময়ে চলে গেছে, তখন তাদের পায়ের চাপে মাটি ও ঘাস চাপা প'ড়ে একটা আকস্মিক সংকেত তৈরি হয়েছে। পরবর্তী পথিকেরা পায়ের তলায় তারই আহ্বান পায়। এমনি করে পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে। যদি পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে মানুষ এ পথ বানাতে বিশেষ চেষ্টা করত তা হলে রাস্তা হত সিধে; কিন্তু দেখতে পাই, মেঠো পথ চলেছে বেঁকে-চুরে। তাতে রাস্তা দীর্ঘ হয়েছে কি না সে কথা কেউ বিচার করে নি।

ভাষার আকস্মিক সংকেত এমনি ক'রে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আঁকাবাঁকা পথ। হিসেব ক'রে তৈরি হয় নি, হয়েছে ইশারা থেকে ইশারায়। পুরোনো রাস্তা কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে, আবার তার উপরে নতুন সংস্কারেরও হাত পড়েছে। অনেক খুঁত আছে তার মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসংগত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে।

৩

মানুষের একটা গুণ এই যে সে প্রতিমূর্তি গড়ে; তা সে পটে হোক, পাথরে হোক, মাটিতে ধাতুতে হোক। অর্থাৎ একটি বস্তুর অনুরূপে আর-একটিকে বানাতে সে আনন্দ পায়। তার আর-একটি গুণ প্রতীক তৈরি করা, খেলার আনন্দে বা কাজের সুবিধের জন্যে। প্রতীক কোনো-কিছুর অনুরূপ হবে, এমন কথা নেই।

মুখোষ প'রে বড়োলাটসাহেবের পক্ষে অবিকল রাজার চেহারার নকল করা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের গদিতে তিনি রাজার স্থান দখল করে কাজ চালান—তিনি রাজার প্রতীক বা প্রতিনিধি। প্রতীকটা মেনে নেওয়ার ব্যাপার। ছেলেবেলায় মাস্টারি-খেলা খেলবার সময় মেনে নিয়েছিলুম বারান্দার রেলিংগুলো আমার ছাত্র। মাস্টারি শাসনের নিষ্ঠুর গৌরব অনুভব করবার জন্যে সত্যিকার ছেলে সংগ্রহ করবার দরকার হয় নি। এক টুকরো কাগজের সঙ্গে দশ টাকার চেহারার কোনো মিল নেই, কিন্তু সবাই মিলে মেনে নিয়েছে দশ টাকা তার দাম, দশ টাকার সে প্রতীক। এতে দলের লোকের দেনাপাওনাকে সোজা ক'রে দেওয়া হল।

ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। বাঘে মানুষকে খায়, এই সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টা নানা কারণেই অসংগত। 'বাঘ' ব'লে একটা শব্দকে মানুষ বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে-সমস্তই ব্যবহার করা এবং জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে। মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তার একটি বিরাট প্রতীকের জগৎ। এই প্রতীকের জালে জল স্থল আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য সে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দূর দেশে ও দূর কালে। ভাষা গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সহজ হয়েছে যে প্রতীকরচনার শক্তিতে, প্রকৃতির কাছ থেকে সেই দানটাই মানুষের সকল দানের সেরা।

ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরও অনেক সূক্ষ্ম তার কাজ। ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল তো চোখের দেখার সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নয়। যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবলমাত্র ভাবা যায়, মানুষের

সবচেয়ে বড়ো দেনাপাওনা তাদেরই নিয়ে। খুব একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বলতে চাই, তিনটে সাদা গোরু। ঐ 'তিন' শব্দটা সহজ নয়, আর 'সাদা' শব্দটাও যে খুব সাদা অর্থাৎ সরল তা বলতে পারি নে। পৃথিবীতে তিন-জন মানুষ, তিন-তলা বাড়ি, তিন-সের দুধ প্রভৃতি তিনের পরিমাণওয়ালা জিনিস বিস্তর আছে, কিন্তু জিনিসমাত্রই নেই অথচ তিন ব'লে একটা সংখ্যা আছে এ অসম্ভব। এ যদি ভাবতে যাই তা হলে হয়তো তিন সংখ্যার একটা অক্ষর ভাবি, সেই অক্ষরটাকে মুখে বলি তিন; কিন্তু অক্ষর তো তিন নয়। ঐ তিন অক্ষর এবং তিন শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে লুকোনো রয়েছে অগণ্য তিন-সংখ্যক জিনিসের নির্দেশ। তাদের নাম করতে হয় না। ভাষার এই সুবিধা নিয়ে মানুষ সংখ্যা বোঝাবার শব্দ বানিয়েছে বিস্তর। তিনটে তিন সংখ্যার গোরু একত্র করলে ৯টা গোরু হয়, এ কথা স্মরণ করাবার জন্যে গোয়ালঘরে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। গোরু প্রভৃতি সব-কিছু বাদ দিয়ে মানুষ ভাষার একটা কৌশল বানিয়ে দিলে, বললে তিন-ত্রিক্‌খে নয়। ও একটা ফাঁদ। তাতে ধরা পড়তে লাগল কেবল গোরু নয় তিন-সংখ্যা-বাঁধা যে-কোনো তিন জিনিসের পরিমাপ। ভাষা যার নেই এই সহজ কথাটা ধরে রাখবার উপায় তার হাতে নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। ইস্কুলে-পড়া একটি ছোটো মেয়ের কাছে আমার নামতার অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্যে পরিহাস ক'রে বলেছিলুম, তিন-পাঁচে পঁচিশ।

চোখদুটো এত বড়ো ক'রে সে বললে, 'আপনি কি জানেন না তিন-পাঁচে পনেরো।' আমি বললুম, 'কেমন করে জানব বলো, সব তিনই কি এক মাপের। তিনটে হাতিকে পাঁচগুণ করলেও পনেরো, তিনটে টিকটিকিকেও?' শুনে তার মনে বিষম ধিক্কার উপস্থিত হল, বললে, 'তিন যে তিনটে একক, হাতি-টিকটিকির কথা

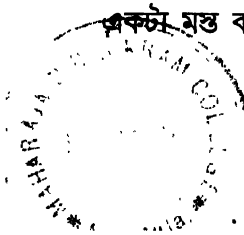
তোলেন কেন।’ শুনে আমার আশ্চর্য বোধ হল। যে একক সরুও নয় মোটাও নয়, ভারিও নয় হাল্কাও নয়, যে আছে কেবল ভাষা আঁকড়িয়ে, সেই নির্গুণ একক ওর কাছে এত সহজ হয়ে গেছে যে, আস্ত হাতি-টিকটিকিকেও বাদ দিয়ে ফেলতে তার বাধে না। এই তো ভাষার গুণ।

‘সাদা’ কথাটাও এইরকম সৃষ্টিছাড়া। সে একটা বিশেষণ, বিশেষ্য নইলে একেবারে নিরর্থক। সাদা বস্তু থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিলে জগতে কোথাও তাকে রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, এক ঐ ভাষার শব্দটাতে ছাড়া। এই তো গেল গুণের কথা, এখন বস্তুর কথা।

মনে আছে আমার বয়স যখন অল্প আমার একজন মাস্টার বলেছিলেন, এই টেবিলের গুণগুলি সব বাদ দিলে হয়ে যাবে শূন্য। শুনে মন মানতেই চাইল না। টেবিলের গায়ে যেমন বার্নিশ লাগানো হয় তেমনি টেবিলের সঙ্গে তার গুণগুলো লেগে থাকে, এই রকমের একটা ধারণা বোধ করি আমার মনে ছিল। যেন টেবিলটাকে বাদ দিতে গেলে মুটে ডাকার দরকার, কিন্তু গুণগুলো ধুয়ে মুছে ফেলা সহজ। সেদিন এই কথা নিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম। অথচ মানুষের ভাষা গুণহীনকে নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কারবার করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের ভাষায় একটা সরকারি শব্দ আছে, ‘পদার্থ’। বলা বাহুল্য, জগতে পদার্থ ব’লে কোনো জিনিস নেই; জল মাটি পাথর লোহা আছে। এমনতরো অনির্দিষ্ট ভাবনাকে মানুষ তার ভাষায় বাঁধে কেন। জরুরি দরকার আছে বলেই বাঁধে।

বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটা বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে ব’লে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই-সব অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীর্তি।



বোঝা-হাল্কা-করা এই-সব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা। সাহিত্যেও তার কমতি নেই। এই মনে করো, 'হৃদয়' শব্দটা বলি অত্যন্ত সহজেই। কারও হৃদয় আছে বা হৃদয় নেই, যত সহজে বলি তত সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি নে। কারও 'মনুষ্যত্ব' আছে বলতে কী আছে তা সমস্তটা স্পষ্ট করে বলা অসাধ্য। এ ক্ষেত্রে ধ্বনির প্রতীক না দিয়ে অন্যরকম প্রতীকও দেওয়া যেতে পারে। মনুষ্যত্ব ব'লে একটা আকারহীন পদার্থকে কোনো-একটা মূর্তি দিয়ে বলাও চলে। কিন্তু মূর্তিতে জায়গা জোড়ে, তার ভার আছে, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া তাকে বৈচিত্র্য দেওয়া যায় না। শব্দের প্রতীক আমাদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না।

এ কথাটা জেনে রাখা ভালো যে, এই-সব ভার-লাঘব-করা সরকারি অর্থের শব্দগুলিকে ইংরেজিতে বলে অ্যাব্স্ট্রাক্ট্ শব্দ। বাংলায়, এর একটা নতুন প্রতিশব্দের দরকার। বোধ করি 'নির্বস্তুক' বললে কাজ চলতে পারে। বস্তু থেকে গুণকে নিষ্ক্রান্ত করে নেওয়া যে ভাবমাত্র তাকে বলবার ও বোঝাবার জন্যে নির্বস্তুক শব্দটা হয়তো ব্যবহারের যোগ্য। এই অ্যাব্স্ট্রাক্ট্ শব্দগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের মন এত দূরে চলে যেতে পেরেছে যত দূরে তার ইন্দ্রিয়-শক্তি যেতে পারে না, যত দূরে তার কোনো যানবাহন পেঁছয় না।

৪

মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে ভঙ্গীতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে, হাসিতে, চোখের জলে এই-সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। এইগুলি হল মানুষের প্রকৃতিদত্ত বোবার ভাষা, এ ভাষায় মানুষের ভাবপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুখ দুঃখ ভালোবাসার বোধ

অনেক সূক্ষ্ম যায়, ঊর্ধ্বে যায়; তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যতদূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে ব'লেই মানুষের হৃদয়াবেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে। সংস্কৃতিমানদের বোধশক্তির রূঢ়তা যায় ক্ষয় হয়ে, তাঁদের অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবের প্রবেশ ঘটে সহজে। গোঁয়ার হৃদয় হচ্ছে অশিক্ষিত হৃদয়। অবশ্য স্বভাবদোষে রুচি ও অনুভূতির পরুষতা যাদের মজ্জাগত তাদের আশা ছেড়ে দিতে হয়। জ্ঞানের শক্তি নিয়েও এ কথা খাটে। স্বাভাবিক মূঢ়তা যাদের দুর্ভেদ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় তাদের বুদ্ধিকে বেশি দূর পর্যন্ত সার্থকতা দিতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে

যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এইরকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ-যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে-হয়-যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্যে; সেইজন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে নানা কবি নানা রকম অত্যুক্তির চেষ্টা করে। সুযোগ নয় তো কী; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য। এই সুযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, কেউ বা নিঃশব্দ বীণাধ্বনির সঙ্গে— অসংগতিকে আরও বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া-ভাঙার কাজ। এইজন্যেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই ব'লে এককে আর ক'রে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে সোনা। এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। এক দিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষা-

সীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূরপ্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্যথা ক'রেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।

✓ জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারি কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ। প্রাণ-লোকে সৃষ্টিব্যাপারে জীবিকার প্রয়োজন যত বড়ো জায়গাই নিক-না, অলংকরণের আয়োজন বড়ো কম নয়। গাছপালা থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপক্ষী পর্যন্ত সর্বত্রই রঙে রেখায় প্রসাধনের বিভাগ একটা মস্ত বিভাগ। পাশ্চাত্য মহাদেশে যে ধর্মনীতি প্রচলিত, পশুরা তাতে অসম্মানের জায়গা পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেই কারণেই য়ুরোপের বিজ্ঞানীবুদ্ধি জীবমহলে সৌন্দর্যকে একান্তই কেজো আদর্শে বিচার করে এসেছে। প্রকৃতিদত্ত সাজে সজ্জায় ওদের বোধশক্তি প্রাণিক প্রয়োজনের বেশি দূরে যে যায়, এ কথা য়ুরোপে সহজে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সৌন্দর্য একমাত্র মানুষের কাছেই প্রয়োজনের অতীত আনন্দের দূত হয়ে এসেছে, আর পশুপক্ষীর সুখবোধ একান্তভাবে কেবল প্রাণধারণের ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ, এমন কথা মানতেই হবে তার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক, সৌন্দর্যকে মানুষ অহৈতুক বলে মেনে নিয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষকে টানে প্রাণযাত্রার গরজে; সৌন্দর্যও টানে, কিন্তু তাতে প্রয়োজনের তাগিদ নেই। প্রয়োজনের সামগ্রীর সঙ্গে আমরা সৌন্দর্যকে জড়িয়ে রাখি, সে কেবল প্রয়োজনের একান্ত ভারাকর্ষণ থেকে মনকে উপরে তোলবার জন্যে। প্রাণিক শাসনক্ষেত্রের

মাঝখানে সৌন্দর্যের একটি মহল আছে যেখানে মানুষ মুক্ত, তাই সেখানেই মানুষ পায় বিশুদ্ধ আনন্দ।

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে—একটা তার গরজের; আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকায় মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

সৃষ্টি বলতে বোঝায় সেই রচনা যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে। বিশ্বে যখন আমরা এমন-কিছুকে পাই যা রূপে রসে নিরতিশয়ভাবে তার সত্তাকে আমাদের চেতনার কাছে উজ্জ্বল করে তোলে, যাকে আমরা স্বীকার না করে থাকতে পারি নে, যার কাছ থেকে অন্য কোনো লাভ আমরা প্রত্যাশাই করি নে, আপন আনন্দের দ্বারা তাকেই আমরা আত্ম-প্রকাশের চরম মূল্য দিই। ভাষায় মানুষের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি সাহিত্য। এই সৃষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে যখন চরম ব'লেই মেনে নিই, তখন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ। সে যদি এমন-কিছু হয় সচরাচরের সঙ্গে যার মিল না থাকে, অথচ যাকে নিশ্চিত প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলি 'এই যে তুমি' তা হলে সেও সত্য হয়েই সাহিত্যে স্থান পায়, প্রাকৃত জগতে যেমন সত্যরূপে স্থান পেয়েছে পর্বত নদী। মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি তলব করতেই চাই নে, তাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছি এই যথেষ্ট। আমরা যখন নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরোই তখন সেখানে নিত্য অভ্যাসে আমাদের চৈতন্য মলিন

হয় নি বলেই সেখানকার অতিসাধারণ দৃশ্য সম্বন্ধেও আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট থাকে; এই স্পষ্ট অনুভূতিতে যা দেখি তার সত্যতা উজ্জ্বল, তাই সে আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি সেই সাহিত্যকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসজ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার্য করে তোলে। এমনি করে ভাষার জিনিসকে মানুষের মনের কাছে সত্য করে তোলবার নৈপুণ্য যে কী, তা রচয়িতা স্বয়ং হয়তো বলতে পারেন না।

প্রাকৃতিক জগতে অনেক-কিছুই আছে যা অকিঞ্চিৎকর বলে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অনেক আছে যা বিশেষভাবে সুন্দর, যা মহীয়ান, যা বিশেষ কোনো ভাবস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে তাই সে বাস্তব রূপে বিশেষ ভাবে আমাদের মনকে টেনে নেয়। মানুষের রচিত সাহিত্যজগতে সেই বাস্তবের বাছাই-কবা হতে থাকে। মানুষের মন যাকে বরণ করে নেয় সব-কিছুর মধ্যে থেকে সেই সত্যের সৃষ্টি চলছে সাহিত্যে; অনেক নষ্ট হচ্ছে, অনেক থেকে যাচ্ছে। এই সাহিত্য মানুষের আনন্দ-লোক, তার বাস্তব জগৎ। বাস্তব বলছি এই অর্থে, যে, সত্য এখানে আছে বলেই সত্য নয়, অর্থাৎ এ বৈজ্ঞানিক সত্য নয়—সাহিত্যের সত্যকে মানুষের মন নিশ্চিত মেনে নিয়েছে বলেই সে সত্য।

মানুষ জানে, জানায়; মানুষ বোধ করে, বোধ জাগায়। মানুষের মন কল্পজগতে সঞ্চরণ করে, সৃষ্টি করে কল্পরূপ; এই কাজে ভাষা তার যত সহায়তা করে ততই উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতর পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। কেন হয় তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

যে সত্য আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য।

কিন্তু যা-কিছু আমাদের সুখদুঃখবেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারও প্রশস্ত, কারও সংকীর্ণ। কারও দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে, বিশ্বের ছোটো-বড়ো অনেক কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ-অণুবীক্ষণ শক্তি। আবার কারও কারও জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি ক'রে আলো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাই মানুষের বাস্তববোধের বিশেষত্ব ও আয়তনেই যথার্থ তার পরিচয়। সে যদি কবি হয় তবে তার কাব্যে ধরা পড়ে তার মন এবং তার মনের দেখা বিশ্ব। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কবিদের দৃষ্টিক্ষেত্রের আলো বদল হয়ে গেছে, এ কথা সকলেই জানে। প্রবল আঘাতে তাদের মানসিক পথযাত্রার রথ পূর্বকার বাঁধা লাইন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তার পর থেকে পথ চলেছে অন্য দিকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরোনো সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা; বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে।

সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় ব'লে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি ব'লেই।

মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে, ধর্মকে অস্বীকার ক'রে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।

অপর দিকে আমাদের পুরাণ-কথাসাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদচরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যা গণনা করে তাঁরা মানবসত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায় শক্তির কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সবচেয়ে বড়ো সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্য।

সাহিত্যের জগৎকে আমি বলছি বাস্তবের জগৎ, এই কথাটার

তাৎপর্য আরও একটু ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। এ তর্ক প্রায় মাঝে মাঝে উঠেছে যে, প্রাকৃত জগতে যা অপ্রিয়, যা দুঃখজনক, যাকে আমরা বর্জন করতে ইচ্ছা করি, সাহিত্যে তাকে কেন আদর করে স্থান দেওয়া হয়, এমন-কি, বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।

যা আমাদের মনে জোরে ছাপ দেয়, বাস্তবতার হিসাবে তারই প্রভাব আমাদের কাছে প্রবল। দুঃখের ধাক্কায় আমরা একটুও উদাসীন থাকতে পারি নে। এ কথা সত্য হলেও তর্ক উঠবে, দুঃখ যখন অপ্রিয় তখন সাহিত্যে তাকে উপভোগ্য বলে স্বীকার করি কেন। এর সহজ উত্তর এই— দুঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যেই তার প্রমাণ। যা-কিছু আমরা বিশেষ করে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতে আনন্দ। চার দিকে আমাদের অনুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে তা হলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু; কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্ষীণতা তা হলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে করে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে; কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্যে আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি। গল্পে ভূতের ভয়ের অনুভূতিতে ছেলেরা পুলকিত হয়, কেননা তাদের মন এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা পায় বিনা দুঃখের মূল্যে। কাল্পনিক ভয়ের আঘাতে ভূত তাদের কাছে নিবিড়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে, আর এই বাস্তবের অনুভূতি ভয়ের যোগেই আনন্দজনক। যারা সাহসী তারা বিপদের সম্ভাবনাকে যেচে ডেকে আনে, ভয়ানকে আনন্দ আছে ব'লেই। তারা এভারেস্টের চূড়া লঙ্ঘন করতে যায়

অকারণে। তাদের মনে ভয় নেই বলেই ভয়ের কারণ-সম্ভাবনায় তাদের নিবিড় আনন্দ। আমার মনে ভয় আছে, তাই আমি দুর্গম পর্বতে চড়তে যাই নে, কিন্তু দুর্গমযাত্রীদের বিবরণ ঘরে বসে পড়তে ভালোবাসি; কেননা তাতে বিপদের স্বাদ পাই অথচ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। যে ভ্রমণবৃত্তান্তে বিপদ যথেষ্ট ভীষণ নয় তা পড়তে তত ভালো লাগে না। বস্তুত প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দ-জনক, কেননা সেই অনুভূতি দ্বারা প্রবলরূপে আমরা আপনাকে জানি। সাহিত্য বহু বিচিত্রভাবে আমাদের আপনাকে জানার জগৎ, অথচ সে জগতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

সাহিত্যে মানুষের আত্মপরিচয়ের হাজার হাজার ঝরনা বয়ে চলেছে — কোনোটা পঙ্কিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা ক্ষীণ, কোনোটা পরিপূর্ণপ্রায়। কোনোটা মানুষের মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নবজাগরণের।

বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবি-রূপে, ঘটনারূপে; অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট। যেমন মন্থরা বা ভাঁড়ুদত্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যখন তার ছবি দেখি তখন হেসে কিংবা কোনো রকমে উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠি, 'ঠিক বটে'। এইরকম কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে নিশ্চিত স্বীকার করাতে আমাদের আনন্দ আছে। নিয়তই বহুলক্ষ পদার্থ এবং অসংখ্য ব্যাপার যা আমাদের জীবনমনের ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে তা প্রবলরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার

বিষয় হয় না। কিন্তু যা-কিছু স্বভাবত কিংবা বিশেষ কারণে আমাদের চৈতন্যকে উদ্রিক্ত ক'রে আলোকিত করে, সেই-সব অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের মনের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, তারা বিচিত্রভাবে আমাদের স্বভাবকে পূর্ণ করে। মানুষের সাহিত্য মানুষের সেই সম্ভাবিত সম্ভবপর অসংখ্য অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। জাভাতে দেখে এলুম আশ্চর্য নৃত্যকৌশলের সঙ্গে হনুমানে ইন্দ্রজিতে লড়াইয়ের নাট্যাভিনয়। এই দুই পৌরাণিক চরিত্র এমন অন্তরঙ্গভাবে তাদের অভিজ্ঞতার জিনিস হয়ে উঠেছে যে চার দিকের অনেক পরিচিত মানুষের এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের চেয়ে এদের সত্তা এবং আচরণ তাদের কাছে প্রবলতররূপে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। এই সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নাচে গানে। সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়, এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতার জগৎসৃষ্টি ক'রে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে মূর্তিমান ক'রে মেটাচ্ছে সে আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনায় চরিত্ররচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।

এইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থা-ভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে,

শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই-রকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয়; তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান হয়ে সকলপ্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান নাহয় নাই তৈরি হল।

৬

সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন্ এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ।

মানুষ বানিয়েছে আপনার গায়ের কাপড়। বয়স বাড়তে বাড়তে তার দেহের মাপের বদল হয়। বারবার পুরোনো কাপড় ফেলে

দিয়ে নতুন কাপড় না বানালে তার চলে না। জাতির মন কখনো বাড়ে, আবার রুগী উপবাসীর যেরকম দশা হয় তেমনি কখনো বা সে কমেও বটে। কিন্তু পুরোনো জামার মতো ভাষাটাকে ফেলে দিয়ে দর্জির দোকানে নতুন ভাষার ফরমাশ দিতে হয় না। মনের গড়নের সঙ্গেই চলেছে তার গড়ন, মনের বাড়নের সঙ্গেই তার বাড়। আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই, সত্তর বছর পূর্বের বাঙালির মন আর এখনকার মনে তফাত বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যে-মধ্যেও ভিতরে-ভিতরে কাজ করছে। সত্তর বছর আগেকার ভাষা এখন নেই। এর উপরে লেগেছে অনেক মনের নব নব স্পর্শ ও প্রবর্তনা। কিন্তু সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক-একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

৭

আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ। কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে তার

বায়ুমণ্ডল, যেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, যেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো, তেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে— সমস্ত দেশকে সেই দেয় অন্তরের ঐক্য।

পৃথিবীর আবহ-আস্তরণের মতোই তার সব কাজ, সব দান সকলকে নিয়ে। যা ভূখণ্ড এ তাকেই করে তুলেছে দেশ। ধারাবাহিক বৃহৎ আত্মীয়তার ঐক্যবেষ্টনে প্রাকৃতিককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তাকে করেছে মানবিক। এই সীমার মধ্যে অনেক যুগের মা তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে একই ভাষার গান গেয়ে, সন্ধেবেলায় তাদের কোলে টেনে এনে বলেছে রূপকথা একই ভাষায়। পূজা করেছে এরা এক ভাষার মন্ত্রে, স্ত্রী পুরুষ একই ভাষায় পরস্পর ভালোবাসার আলাপ করেছে; তার ভাষা অভিষিক্ত হয়ে গেছে প্রাণের রসে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ভুলচুক হয়েছে, শয়তানি বুদ্ধি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছে, হানাহানি বাধিয়েছে, সমস্ত দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা খুঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু সেটাই সমস্ত দেশের প্রকৃতিতে সবচেয়ে সত্য আকার ধরে মুখ্য স্থান নেয় নি, তাই দেশের লোক দেশকে বলেছে মাতৃভূমি। এখানে উন্মেষিত হয়েছে এমন একটা মানবিকতার নিবিড় ঐক্য যা সমস্ত জাতকে রক্ষা করে, প্রবল করে, জ্ঞান দেয়, আনন্দিত করে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে। যে দেশে এইরকম ঐক্যের মহৎরূপ অপূর্ণতা থেকে ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, বারবার উদ্ধার করেছে সমস্ত জাতকে বিঘ্নবিপদ থেকে বীর্য ও শুভ বুদ্ধির জোরে, সেই দেশকেই মানুষ একান্তভাবে আপনার মধ্যে পেয়েছে, ভালোবেসেছে, সত্যি করে তাকে বলতে পেরেছে মাতৃভূমি।

এ কথা হয়তো আমরা অনেকে জানি নে যে, বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের মাতৃভূমি নাম আমাদের দেওয়া নয়। ঐ শব্দটাকে আমরা তর্জমা করে নিয়েছি ইংরেজি মাদারল্যান্ড্ থেকে। আমার বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে একটি উদ্‌বোধনের বিশেষ যুগ

এসেছিল যখন ভরতরাজবংশকে স্মৃতির কেন্দ্রস্থলে রেখে ভারতের আর্যজাতীয়েরা নিজের ঐক্য-উপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই যুগেই বেদ পুরাণ দর্শনশাস্ত্র, লোকপ্রচলিত কথা ও কাহিনী. সংগ্রহ করবার উদ্যোগ এ দেশে জেগে উঠেছিল। সে অনেক দিনের কথা।

কিন্তু স্বাজাতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে উপরাজ্যে পরস্পর কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে, সাধারণ শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি।

এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, সে তার সংস্কৃতভাষা। এই ভাষাই ধর্মে কর্মে কাব্য-ইতিহাস-পুরাণ-চর্চায় তার সভ্যতাকে রেখেছিল বাঁধ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল ঐক্যবোধের নাড়ির জাল। দেশের যে মাতৃশক্তি হৃদয়ের আত্মীয়তায় দেশের নানা জাতিকে এক সন্ততিসূত্রে বাঁধতে পারত তার উৎস ছিল না এর মাটিতে। কিন্তু যে পিতৃশক্তি চিত্তোৎকর্ষের পথ দিয়ে ভাবী বংশকে জ্ঞানসম্পদে সম্মানিত করেছে তা আমরা পেয়েছি একটি আশ্চর্য ভাষার দৌত্য হতে।

ভারতবর্ষের নাম মাতার নাম নয়, কেননা ভারতবর্ষ যথার্থই পিতৃভূমি। তাই ভারতবর্ষের দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত ঋষিদের নাম, আর রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের চরিত-বৃত্তান্ত। তাই পরকালে পিতৃলোকের পথকে সদ্গতির পথ বলে জানি।

এ কথা মনে রাখা উচিত যে, দেশবাসী সকলকে আমরা এক নাম দিয়ে পরিচিত করি নি। মহাভারতে আমরা কাশী কাঞ্চি মগধ কোশল প্রভৃতি প্রদেশের কথা শুনেছি, কিন্তু তাদের সমস্তকে নিয়ে এক দেশের কথা শুনি নি। আজ আমরা যে হিন্দু নাম দিয়ে

নিজেদের ধর্ম ও আচার-গত একটা বিশেষ ঐক্যের পরিচয় দিয়ে থাকি, সে নামকরণ আমাদের নিজকৃত নয়। বাইরে থেকে মুসলমান আমাদের এই নাম দিয়েছিল। হিন্দুস্থান নাম মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। আর যে একটি নামে আমাদের দেশ জগতের কাছে এক দেশ বলে খ্যাত সে হচ্ছে ইন্ডিয়া, সে নামও বিদেশী। বস্তুত ভারতবাসী বোঝাবার কোনো নামকে যদি যথার্থ ন্যাশনাল বলা যায়, অর্থাৎ যে নামে ভারতের সকল জাতিকে বর্ণ-ধর্ম-আচার-নির্বিশেষে এক ব'লে ধরা হয়েছে, সে ইন্ডিয়ান। আমাদের ভাষায় আমাদের স্বাদেশিক নাম নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিম-বঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। মাতৃভাষা নামটা আজকাল আমরা ব্যবহার করে থাকি, এ নামও পেয়েছি আমাদের নতুন শিক্ষা থেকে। ইংরেজিতে আপন ভাষাকে বলে মাদার টাঙ্গ্।

মাতৃভাষা তারই তর্জমা। এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিণী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চেতিয়ে তুলতে হয় নি, হয়েছে স্বভাবতই।

৮

বাংলাভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটাশি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভা-সমিতিতে ইস্কুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ

জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়ো দিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

৯

বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী— একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার-করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা

লাইম তুলে দিলে তার জবাব হবে; কবি বলেন : কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে, যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।

আমাদের দিনরাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।

তবু একটা কথা মানতে হবে যে, মানুষের বলবার কথা সবই যে সহজ তা নয়; এমন কথা আছে যা ভালো করে এঁটে না বললে বলাই হয় না। সেই-সব বিচার-করা কথা কিংবা সাজিয়ে-বলা কথা চলে না দিনরাত্রির ব্যবহারে, যেমন চলে না দরবারি পোশাক কিংবা বেনারসি শাড়ি। আমরা সর্বদা মুখের কথায় বিজ্ঞান আওড়াই নে। তত্ত্বকথাও পণ্ডিতসভার, তার আলোচনায় বিশেষ বিদ্যার দরকার করে। তাই তর্ক ওঠে, এদের জন্যে চলতি ভাষার বাইরে একটা পাকা গাঁথুনির ভাষা বানানো নেহাত দরকার; সাধু ভাষায় এরকম মহলের পত্তন সহজ, কেননা, ও ভাষাটাই বানানো।

কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক। আমরা লিখিয়ে-পড়িয়ের দলে চলতি ভাষাকে অনেককাল থেকে জাতে ঠেলেছি। সাহিত্যের আসরে তাকে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান এসেছে তাড়া করে।

সেইজন্যেই খিড়কির দরজায় পথ চলার অভ্যাসটাই ওর হয়ে গেছে স্বাভাবিক। অন্দরমহলে যে মেয়েরা অভ্যস্ত তাদের ব্যবহার সহজ হয় পরিচিত আত্মীয়দের মধ্যেই, বাইরের লোকদের সামনে তাদের মুখ দিয়ে কথা সরে না। তার কারণ এ নয় যে তাদের শক্তি নেই, কিন্তু সংকুচিত হয়েছে তাদের শক্তি। পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীলতার ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয় নি; কিন্তু হবার বাধা বাইরের শাসনে, স্বভাবের মধ্যে নয়।

সে অনেক দিনের কথা। তখন রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। তাঁর একজন ছাত্রের কাছে শুনেছি, পরীক্ষা দিতে যাবার পূর্বে বাংলা রচনা সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে গিয়ে ষত্বে ণত্বে কিংবা হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরে যদি ধাঁধা লাগিয়ে দেয় তা হলে লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" সেদিনকার দিনে এটি সোজা কথা ছিল না। তখনকার সাধু বাংলা ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুতেই সইতে পারত না, তখনকার রুগীরা যেমন ঠাণ্ডা জল খেতে পেত না তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও।

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে'-কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তা হলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশধ্বংসের উৎপত্তি : এর ক্রিয়া কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। 'তাঁর কাজে ও কথায় অসংগতি' : মুখের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এও বলা যায় 'তাঁর কাজে কথায় মিল নেই'। 'বাসুকি ভীমকে আলিঙ্গন করলেন' এ কথাটা মুখের

ভাষায় অশুচি হয় না, আবার 'বাসুকি ভীমের সঙ্গে *কোলাকুলি করলেন' এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না।* বিজ্ঞানে দুর্বোধ তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের সাধু ভাষাও গলদ্‌ঘর্ম হয়, আবার চলতি ভাষারও চোখে অন্ধকার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে। নতুন-বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেরই হবে সমান স্বত্ব।

১০

এইখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষা-গুলিকেও এমনি করেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার নেওয়া কিংবা তারই উপাদান নিয়ে তারই ছাঁচে ঢালা। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায়, তার পুরাতন পরিচিত দ্রব্যের নামগুলি স্যাক্‌সন এবং কেল্ট। এগুলি সব আদিম জাতির আদিম অবস্থার সম্পত্তি। সেই পুরাতন কাল থেকে যতই দূরে চলে এসেছে ততই তার ভাষাকে অধিকার করেছে গ্রীক ও লাটিন। আমাদেরও সেই দশা। খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ যোলো-আনা চলা অসম্ভব।

অভিধান দেখলে টের পাওয়া যাবে ইংরেজি ভাষার অনেকখানিই গ্রীক-লাটিনে গড়া। বস্তুত তার হাড়ে মাস লেগেছে ঐ ভাষায়। কোনো বিশেষ লেখার রচনারীতি হয়তো গ্রীক-লাটিন-ঘেঁষা, কোনোটার বা এংলো-স্যাক্‌সনের ছাঁদ। তাই বলে ইংরেজি ভাষা দুটো দল পাকিয়ে তোলে নি। কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া ক'রে তাই নিয়ে কোনো সম্প্রদায়

কৌলীন্যের বড়াই করে না। নানা বন্দর থেকে নানা শব্দসম্পদের আমদানি ক'রে কথার ও লেখার একই তহবিল তারা ভর্তি করে তুলেছে। ওদের ভাষার খিড়কির দরজায় একতারা-বাজিয়ের আর সদর দরজায় বীণার ওস্তাদের ভিড় হয় না।

আমাদের ভাষাও সেই এক বড়ো রাস্তার পথেই চলেছে। কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই। মনে তো আছে, আমার অল্প বয়সে বাড়ির কোনো চাকর যখন এসে জানালে 'একজন বাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন', মনিবদের আসরে চার দিক থেকে হাসি ছিটকে পড়ল। যদি সে বলত 'অপিক্ষে' তা হলে সেটা মানানসই হত। আবার অল্পকিছুদিন আগে আমার কোনো ভৃত্য মাংসের তুলনায় মাছ খাওয়ার অপদার্থতা জানিয়ে যখন আমাকে বললে 'মাছের দেহে সামর্থ্য কতটুকুই বা আছে', আমার সন্দেহ হয় নি যে সে উচ্চ প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষা পাশ করেছে। আজ সমাজের উপরতলায় নীচের তলায় ভাষাব্যবহারে আর্য-অনার্যের মিশোল চলেছে। মনে করো সাধারণ আলাপে আজ যদি এমন কথা কেউ বলে যে 'সভ্যজগতে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রন্থি পাকিয়ে রাষ্ট্র-নীতির জটিলতা যতই বেড়ে উঠছে শান্তির সম্ভাবনা যাচ্ছে দূরে', তা হলে এই মাত্র সন্দেহ করব, লোকটা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মেশাবার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বাক্যকে প্রহসনে উদ্‌ধৃত করবার যোগ্য বলে কেউ মনে করবে না। নিঃসন্দেহ এর শব্দগুলো হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক, কেননা বিষয়টাই তাই। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হত না, এখন তা হয়ে থাকে, কাজেই কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে

না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হাল্কা ভারি সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাস-পোর্ট মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃত-সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোশাক প'রে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না, বললে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও ছাড়া আর-কোনো কথাই নেই। গুরুচণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।

ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো ক'রে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও হবে না।

সুনীতিকুমার বলেন খৃস্টীয় দশম শতকের কোনো-এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই 'জন্ম' কথাটা খাটে না। যে জিনিস অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভসীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিংশ শতকের বাঙালি আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। শতকে শতকে ভাষা ক্রমশ ফুটে উঠেছে, আধুনিক কালেও চলছে তার পরিণতি। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক। গত ষাট বছরে যা ঘটেছে দু-তিন শতকেও তা ঘটে নি।

বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়া-ব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সদ্য-ডিম-ভাঙা পাখির বাচ্ছার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। রূপগোস্বামীর লেখা কারিকা থেকে পুরোনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা দেখলেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে। · · · পূর্ব্বরাগের মূল দুই। হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।১

ক্রিয়াপদ-ব্যবহার যদি পাকা হত, তা হলে উড়ে চলার বদলে ভাষার এরকম লাফ দিয়ে দিয়ে চলা সম্ভব হত না। সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলব যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে। পুরাতন গদ্যের বিস্তৃত নমুনা যদি পাওয়া যেত তা হলে ক্রিয়াপদ-অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয় করা সহজ হত।

রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখতে বসেছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে, কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি।

সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে তার একটা নমুনা দিই—

গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সংকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী

১ সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস -লিখিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হল। —সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫, পৃ ৪৬

জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সেসব উৎসব শেষ হইলে কি হইবে।২

তার পরে বিদ্যাসাগর এই কাঁচা ভাষায় চেহারার শ্রী ফুটিয়ে তুললেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।

আমরা পুরাতন সাহিত্যে পেয়েছি পদ্য, সেইটেই বনেদি। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না, সাধু ভাষার আদর্শ ছিল তার মধ্যে। ভাষাকে ছন্দে-ওজন-করা পদে বিভক্ত করতে গেলে তার মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলার নিয়ম খাটে না, ক্রমে তার একটা বিশেষ রীতি বেঁধে যায়। প্রথমত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদের সহজ পর্যায় রক্ষা হতেই পারে না। তার পরে তার মধ্যে কতকগুলি পুরোনো শব্দ ও রীতি থেকে যায়, ছন্দের আশ্রয় পেয়ে যারা কালের বদল মানে না। চারটে লাইন পদ্য বানিয়ে তার দৃষ্টান্ত দেখানো যাক—

কার সনে নাহি জানি করে বসি কানাকানি,
সাঁঝবেলা দিগ্‌বধূ কাননে মর্মরে।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা কী লাগি আপনহারা
মানিকের বরমালা গাঁথে কার তরে।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে হবে এই-রকম— সন্ধ্যাকালে দিগ্‌বধূ অরণ্যমর্মরধ্বনিতে কাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত তাহা জানি না। জানি না কী কারণে ও কাহার জন্য আত্মবিহ্বল অবস্থায় সে আপন বস্ত্রাঞ্চলে নক্ষত্র সংগ্রহপূর্বক মাণিক্যের বরমাল্য গ্রন্থন করিতেছে।

২ সংবাদপ্রভাকর, ২৩ এপ্রিল, ১৮৫২। —বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৬৮



'সনে' কথাটা এখন আর বলি নে, প্রাচীন পদাবলীতে ঐ অর্থে 'সঙে' কথা সর্বদা পাওয়া যায়। 'নাহি জানি' কথাটার 'নাহি' শব্দটা এখনকার নিয়মে 'জানি'র সঙ্গে মিলতে পারে না। 'নাহি' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'নাস্তি', চল্লিত কথায় 'নেই'। 'জানি'র সঙ্গে 'নেই' জোড়া যায় না, বলি 'জানি নে'। 'সাঁঝবেলা' গ্রাম্য-ভাষায় এখনো চলে, কিন্তু যাদের জন্যে ঐ শ্লোকটা লেখা তাদের সঙ্গে আলাপে 'সাঁঝবেলা' শব্দটা বেখাপ। 'বসিয়া'র জায়গায় 'বসি' আমরা বলি নে। যে শ্রেণীর লোকের ভাষায় 'লেগে' শব্দের ব্যবহার চলে তাদের খুশি করবার জন্যে দিগ্বধূ কখনো তারার মালা গাঁথেই না। 'জন্যে'র পরিবর্তে 'লাগি' বা 'লাগিয়া' কিংবা 'তরে' শব্দটা ছন্দের মধ্যস্থতায় ছাড়া ভদ্রনামধারীদের রসনায় প্রবেশ পায় না। যেমতি তেমতি নেহারো উড়িলা হেরো মোরে পানে যবে হেথা সেথা নারে তারে প্রভৃতি শব্দ পদ্যের ফরমাশি।

যদি বর্ষার দিনে বন্ধু এসে কথা জুড়ে দেয় 'হেরো ঐ পূব দিকের পানে, রহি রহি বিজুলি চমক দেয়, মোর ডর লাগে, নাহি জানি কী লাগি সাধ যায় তোমা সনে একা বসি মনের কথা করি কানাকানি', তবে এটাকে মধুরালাপের ভূমিকা বলে কেউ মনে করবে না, বন্ধুর জন্যে উদ্‌বিগ্ন হবে।

তবু মন ভোলাবার ব্যবসায়ে পদ্য যদি সাদা ভাষার বাজে মালমশলা মেশায় তবে তাকে মাপ করা যায়, কিন্তু চলতি ব্যবহারে গদ্য যদি হঠাৎ সাধু হয়ে ওঠে তবে মহাপণ্ডিতেরাও মনে করবে, বিদ্রূপ করা হচ্ছে। কারও মাসির 'পরে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে কেউ যদি বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় বলে 'আপনকার মাতৃষ্বসা আশা করি দুঃসাধ্য অতিসার ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন', তবে বোনপো ইংরেজের মুখে শুনলে মনে মনে হাসবে, বাঙালির মুখে শুনলে উচ্চহাস্য ক'রে উঠবে।

তর্ক ওঠে, বাংলাদেশে কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক

কথ্যভাষা বলে মেনে নেব। উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে-সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চার দিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকলদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সর্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত। এই ভাষায় ক্রমে পূর্ববঙ্গেরও হাত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, আমরা দক্ষিণের লোকেরা 'সাথে' শব্দটা কবিতায় ছাড়া সাহিত্যে বা মুখের আলাপে ব্যবহার করি নে। আমরা বলি 'সঙ্গে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক, 'সঙ্গে' কথাটা 'সাথে'র কাছে হার মেনে আসছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মাত্র চারজন লোক : এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায় শুনি। বরাবর বলে এসেছি 'চারজনমাত্র লোক', অর্থাৎ চারজনের দ্বারা মাত্রা-পাওয়া, পরিমিত-হওয়া লোক। অবশ্য 'মাত্র' শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার সুবিধে হয়। ভাষা সব সময়ে যুক্তি মানে না।

যা হোক, যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপট।

১১

মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা

সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে।

ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোট-বাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল', তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়াগরজন
রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও, বলা থামে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি অলকার বদলে

হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে, 'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। 'আমি আছি' এই অনুভূতিটা তো বদ্ধ নয়, এ-যে সহস্র রূপে চলায় ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত নন্দিত হচ্ছে ততদিন 'আমি আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে, 'তুমি যেমন আছ আমিও তেমনি আছি'। 'আমি আছি' এই সত্যটি কেবলই প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি চলছি'র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চার দিকের সঙ্গে যখন সুসংগত হয়, সুন্দর হয়, তখনই আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দ রূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

একদা ছিল না ছাপাখানা, অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

এক শ্রেণীর কথা ছিল যেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাসের পরামর্শ, শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন্দ ফল। এই-সমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্যে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।

চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা ক'রে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা

হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বস্তি। তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান বয়সেরই আধুনিক, এমন-কি ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাকরেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়।
অকূল পাড়ি, থামতে নারি,
সদাই ধারা ধায়।
ধারার টানে তরী চলে,
ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগার
হল বিষম দায়।

এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক। তবুও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। উপরের ঐ কবিতাকে সাধু ভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত-মতো—

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে
ডাক যেন শোনা যায়।
কূলহীন পাড়ি, থামিতে না পারি,
নিশিদিন ধারা ধায়।
সে-ধারার টানে তরীখানি চলে,
সেই ডাক শুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও জগার
হয়েছে বিষম দায়।

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত —

অচিন্‌ডাকে নদীখাঁকে ডাক্যে শোনা যায়।

সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যেণ্টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে', 'মন' আর 'যে', এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধু ভাষার গানে 'মন' আর 'মোর' হসন্ত শব্দ হলেও হসন্ত শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর এঁটে যায় না।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ দুই সংখ্যার ওজনে। যেমন—

খনা ডেকে ব'লে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।
দিনে রোদ রাতে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।

এমনি ক'রে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে তিনের মাত্রা। যেমন—

আনহি বসত আনহি চাষ,
বলে ডাক তাহার বিনাশ।

কিংবা—

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে,
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে
ভাদরে কাড়ান শিষকে,
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

দুই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা

সুরে। এই ছন্দে প্রবাহিত প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হৃদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবনযাত্রায়, তার ভাগ্য-দেবতা ছিল অত্যাচারপরায়ণ, সে এমন নৌকোয় ভাসছিল যার হাল ছিল না তার নিজের হাতে; যখন তার আকাশ থাকত শান্ত তখন গ্রামের এ-ঘাটে ও-ঘাটে চলত তার আনাগোনা সামান্য কারবার নিয়ে, কখনো বা দিনের পর দিন দুর্যোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনিশ্চয়তায় হঠাৎ কে কোথায় পৌঁছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নৌকোসুদ্ধ হত ভরাডুবি। এরা ছড়া বাঁধে নি নিজের কোনো স্মরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধে নি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখবেদনায়। এরা নিঃসন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের জবানিতে প্রকাশ করে নি তার হাসিকান্না। দেবতার চরিত-বৃত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ; হরপার্বতীর লীলায় এরা নিজের গৃহস্থালির রূপ ফুটিয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজ-বন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধি-বিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম সীমার দূর গিরিমালার মতোই; তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, তা সনাতন ভারতের। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে, কবিকঙ্কণের সঙ্গে, রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্নদামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল বাংলার; তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল এর পদবিন্যাস। গানের সুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত,

দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরানো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উঁচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে। তার একটা কারণ, এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই এবং তিনের জোড় বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নয়ের অসম মাত্রার ছন্দ।

মোট কথা বলা যায়, দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে। তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে, এবং নানা ওজনের পংক্তিবিন্যাসে। এইরকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পংক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলই বেড়ে চলেছে।

এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ মাত্রা গুনে ছন্দ নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমানুষি পয়ার রচনা ক'রে নিজের কৃতিত্বে বিস্মিত হয়েছিলুম। তার পরে দেখা গেল, কেবল অক্ষর গণনা ক'রে যে ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম জাতের। পদের নানা ভাগ আর মাত্রার নানা সংখ্যা দিয়ে ছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্ত-সংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষর-গোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রা-গোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বস্তুত সাধু ভাষার পয়ারও মাত্রা-গোনা।

সাহিত্যিক কবুলতি পত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রফা হয়েছে যে সাধু ভাষার পদ্য-উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না; অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে। —

সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে,
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্ত শব্দ; কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক—

এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না—

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন্সিবু সদাগর

ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি; আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমতো স্বর বাড়ায় কমায়।—

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এখানে 'বিয়ে হবে' শব্দে মাত্রা ঢিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত 'শিবু ঠাকুরের বিয়ের সভায় তিন কন্যে দান', তা হলে মাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলাদেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে আপনিই

'বিয়ে— হবে' স্বরে টান না দেয়।

বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ।

দুটো লাইনের মাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আবৃত্তির টানে দুটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতি ভাষা আইন জারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

ছেলেভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয় নি। যুক্তিবাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগ্‌বগ্‌ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর-কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর-একটা শব্দ রবাহূত এসে পড়ছে। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই-সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানুষের মগ্নচৈতন্যের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃসৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই। নীচের ছড়াটির মতো এই জাতের রচনা কোনো আধুনিক কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছে কি না জানি নে। খবর যা পেয়েছি তাতে জানা যায়, এর চেয়ে অসংলগ্ন কাব্যের অভ্যুদয় হয়েছে।—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন রেখেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে,
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে,
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে।

কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্‌খান দে, বকুলতলা দে।
বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ বলে রে ভাই, চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ করে,
চাঁদমুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেইজন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।

আদিম কালের মানুষ তার ভাষাকে ছন্দের দোল লাগিয়ে নিরর্থক নাচাতে কুণ্ঠিত হয় নি। নাচের নেশা আছে তার রক্তে। বুদ্ধি যখন তার চেতনায় একাধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে, তখনি সে নেশা কাটিয়ে উঠে মেনেছে শব্দের সঙ্গে অর্থের একান্ত যোগ। আদিম মানুষ মন্ত্র বানিয়েছে, সে মন্ত্রের শব্দে অর্থের শাসন নেই অথবা আছে সামান্য। তার মন ছন্দে দোলায়িত ধ্বনির রহস্যে ছিল অভিভূত। তার মনে ধ্বনির এই-যে সম্মোহনপ্রভাব, দেবতার উপরে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও তার ক্রিয়া সে কল্পনা করত। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক গানের শব্দে অর্থ হয়েছে গৌণ; অর্থের যে আভাস আছে সে কেবল ধ্বনির গুণে মনের মধ্যে মোহ বিস্তার করে, অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্যে তার আদর নয়, ব্যঞ্জনার অনির্দেশ্যতাই তাকে প্রবলতা দেয়। মা তার ছেলেকে নাচাচ্ছে—

থেনা নাচন থেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান,
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচ্‌না কিনে আন্‌।

এর মধ্যে খানিকটা অর্থহীন ধ্বনি, খানিকটা অর্থবান ছবির টুকরো নিয়ে যে ছড়া বানানো হয়েছে তাতে আছে সেই নাচন যে নাচন স্বপ্নলোকে কিনতে পাওয়া যায়।

এই-যে ধ্বনিতে অর্থে মিলে মনের মধ্যে মোহাবেশ জাগিয়ে তোলা, এটা সকল যুগের কবিতার মধ্য দিয়েই কমবেশি প্রকাশ পায়: তাই অর্থের প্রবলতা বেড়ে উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে। ধ্বনির ইশারা দিয়ে যা নিজেকে অভাবনীয় রূপে সার্থক করে তোলে, শিক্ষকের ব্যাখ্যার দ্বারা তা যখন সমর্থনের অপেক্ষা করে তখন কবিতার মন্ত্রশক্তি হারায় তার গুণ। ছন্দ আছে জাদুর কাজে, খেয়াল গেলে বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করতে সে সাহস করে।

সাহিত্যের মধ্যে কারুকাজ, কাব্যে যার প্রাধান্য, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দের বাছাই-সাজাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষায় শব্দ জমে যায় বিস্তর। তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক ফরমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।

রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি দুখের বড়াই। 'বড়াই'-বর্গের অনেক ভারি ভারি কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু 'দুঃখকেই বড়ো ক'রে নিয়েছি' বলবার জন্যে অমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলাভাষায় আর নেই।

যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ।

বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

পরান আমার স্রোতের দীয়া
(আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিসুইৎ-ঢালা।
আন্ধারমাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিসুইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।

নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেন চার দিকের নিসুৎ অন্ধকারে স্রোতে-ভাসানো প্রদীপের মতো— এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক: লহরেরি মালা। ঊর্মি নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples. অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোঁয়াচ-লাগা। রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাধারণত মুখে আসে। তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এ উপমাটায় হালের টাঁকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।

শব্দ-বাছাই ভাব-বাছাইয়ের শিল্পকাজ চলেছে পৃথিবীর সাহিত্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে চলেছে ধ্বনির কাজ। সেটা গদ্যে চলে অলক্ষ্যে, পদ্যে চলে প্রত্যক্ষে।

মুখে মুখে, প্রতিদিনের ব্যবহারে, ভাষায় কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ দলবাঁধা জীব। একলার ব্যবহারে সে আট-পৌরে, দলের ব্যবহারে সুসজ্জিত। সকলের সঙ্গে আচরণে মানুষের যে সৌজন্য সেই তার ব্যবহারের শিল্পকার্য। তাতে যত্নপূর্বক বাছাই-সাজাই আছে। সর্বজনীন ব্যবহারে ব্যক্তিগত খেয়ালের যথেচ্ছাচার নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে ও অন্যকে একটা চিরন্তন আদর্শের দ্বারা সম্মান দেয়। সাহিত্যকে কদাচিৎ শ্রীভ্রষ্ট সৌজন্যভ্রষ্ট করায় প্রকাশ পায় সমাজের বিকৃতি, প্রকাশ পায় কোনো সাময়িক বা মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ।

ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের এবং প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের সঙ্গে মুখোমুখি করাবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে; সাহিত্যজগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে। এই জগৎ-সৃষ্টিতে যে-সকল বড়ো বড়ো রূপকার আপন বিশ্বজনীন প্রতিভা খাটিয়েছেন সেই-সব সৃষ্টিকর্তাদেরকে মানুষ চিরস্মরণীয় বলে স্বীকার করেছে। বলেছে তাঁরা অমর। পঞ্জিকার গণনা অনুসারে অমর নয়। মাহেঞ্জোদারোর ভগ্নাবশেষ যখন দেখি তখন বোঝা যায়, তারই মতো এমন অনেক সভ্যতা মাটির তলায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিনকার বিলুপ্ত সভ্যতাকে যাঁরা একদিন বাণীরূপ দিয়েছিলেন তাঁদের সেই বাণীও নেই, সেই স্মৃতিও নেই। কিন্তু যখন তাঁরা বর্তমান ছিলেন তখন তাঁদের কীর্তির যে মূল্য ছিল সে কেবল উপস্থিত কালের নয়, সে নিত্যকালের। সকল কালের সকল মানুষের চিত্তমিলনবেদিকায় উৎসর্গ করা তাঁদের দান সেদিন অমরতার স্বাক্ষর পেয়েছিল, আমরা সে সংবাদ জানি আর নাই জানি।

১২

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান প্রভেদ ক্রিয়াপদের চেহারায়। যেমন সাধু ভাষার 'করিতেছি' হয়েছে চলতি ভাষায় 'করছি'।

এরও মূল কথাটা হচ্ছে আমাদের ভাষাটা হসন্তবর্ণের শক্ত মুঠোয় আঁটবাঁধা। 'করিতেছি' এলানো শব্দ, পিণ্ড পাকিয়ে হয়েছে 'করছি'।

এই ভাষার একটা অভ্যেস দেখা যায়, তিন বা ততোধিক অক্ষর-

ব্যাপী শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত লাগিয়ে শেষ অক্ষরে একটা স্বরবর্ণ জুড়ে শব্দটাকে তাল পাকিয়ে দেওয়া। যথা ক্রিয়াপদে: ছিট্‌কে পড়া, কাৎরে ওঠা, বাৎলে দেওয়া, সাঁৎরে যাওয়া, হন্‌হনিয়ে চলা, বদ্‌লিয়ে দেওয়া, বিগ্‌ড়িয়ে যাওয়া।

বিশেষ্যপদে: কাৎলা ভেট্‌কি কাঁক্‌ড়া শাম্‌লা ন্যাক্‌ড়া চাম্‌চে নিম্‌কি চিম্‌টে টুক্‌রি কুন্‌কে আধ্‌লা কাঁচ্‌কলা সক্‌ড়ি দেশ্‌লাই চাম্‌ড়া মাট্‌কোঠা পাগ্‌লা পল্‌তা চাল্‌তে গাম্‌লা আম্‌লা।

বিশেষণ, যেমন: প্যাঁচ্‌কে বোট্‌কা আল্‌গা ছুট্‌কো হাল্‌কা বিধ্‌কুটে পাৎলা ডান্‌পিটে শুট্‌কো পান্‌সা চিম্‌সে।

এই হসন্তবর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষায় যুক্তবর্ণের ধ্বনিরই প্রাধান্য ঘটেছে।

আরও গোড়ায় গেলে দেখতে পাই, এটা ঘটতে পেরেছে অকারের প্রতি ভাষার উপেক্ষাবশত।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে দেখলে প্রথমেই কানে ঠেকে অ স্বরবর্ণ নিয়ে। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলায় এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে; যেমন: চালা কাঁচা রাজা। এ-সব আ এক মাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ'কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রস্বমাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'।

বাংলা বর্ণমালার অ সংস্কৃত স্বরবর্ণের কোঠায় নেই। ইংরেজি star শব্দের a সংস্কৃত আ, ইংরেজি stir শব্দের i সংস্কৃত অ, ইংরেজি ball শব্দের a বাংলা অ। বাংলায় 'অল্পসল্প'র বানান যাই হোক, ওর চারটে বর্ণেই সংস্কৃত অ নেই। হিন্দিতে সংস্কৃত অ আছে, বাংলা অ নেই। এই নিয়েই হিন্দুস্থানি ওস্তাদের বাঙালি শাকরেদরা উচ্চ অঙ্গের সংগীতে বাংলা ভাষাকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করেন।

বাংলা অ যদিও বাংলাভাষার বিশেষ সম্পত্তি তবু এ ভাষায় তার অধিকার খুবই সংকীর্ণ। শব্দের আরম্ভে যখন সে স্থান পায় তখনি সে টিঁকে থাকতে পারে। 'কলম' শব্দের প্রথম বর্ণে অ আছে, দ্বিতীয় বর্ণে সে 'ও' হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণে সে একেবারে লুপ্ত। ঐ আদিবর্ণের মর্যাদা যদি সে অব্যাঘাতে পেত তা হলেও চলত, কিন্তু পদে পদে আক্রমণ সইতে হয়, আর তখনি পরাস্ত হয়ে থাকে। 'কলম' যেই হল 'কল্‌মি', অমনি প্রথম বর্ণের আকার বিগড়িয়ে হল ও। শব্দের প্রথমস্থিত অকারের এই ক্ষতি বারে বারে নানা রূপেই ঘটছে, যথা : মন বন ধন্য যক্ষ হরি মধু মসৃণ। এই শব্দগুলিতে আদ্য অকার 'ও' স্বরকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা গেছে, ন-বর্ণের পূর্বে তার এই দুর্গতি, ক্ষ বা ঋ ফলার পূর্বেও তাই। তা ছাড়া দুটি স্বরবর্ণ আছে ওর শত্রু, ই আর উ। তারা পিছনে থেকে ঐ আদ্য অ'কে করে দেয় ও, যেমন : গতি ফণী বধূ যদু। য ফলার পূর্বেও অকারের এই দশা, যেমন : কল্য মদ্য পণ্য বন্য। যদি বলা যায় এইটেই স্বাভাবিক তা হলে আবার বলতে হয়, এ স্বভাবটা সর্বজনীন নয়। পূর্ববঙ্গের রসনায় অকারের এ বিপদ ঘটে না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, অকারকে বাংলা বর্ণমালায় স্বীকার করে নিয়ে পদে পদে তাকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অংশে। শব্দের শেষে হসন্ত তাকে খেদিয়েছে, শব্দের আরম্ভে সে কেবলই তাড়া খেতে থাকে। শব্দের মাঝখানেও অকারের মুখোষ প'রে ওকারের একাধিপত্য, যথা : খড়ম বালক আদর বাঁদর কিরণ টোপর চাকর বাসন বাদল বছর শিকড় আসল মঙ্গল সহজ। বিপদে ওর একমাত্র রক্ষা সংস্কৃত ভাষার করক্ষেপে, যেমন : অ-মল বি-জন নী-রস কু-রঙ্গ স-বল দুর্‌-বল অন্‌-উপম প্রতি-পদ। এই আশ্রয়ের জোরও সর্বত্র খাটে নি, যথা : বিপদ বিষম সকল।

মধ্যবর্ণের অকার রক্ষা পায় য় বর্ণের পূর্বে, যথা : সময় মলয় আশয় বিষয়।

মধ্যবর্ণের অকার ওকার হয়, সে-যে কেবল হসন্ত শব্দে তা নয়। আকারান্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্বেও এই নিয়ম, যথা : বসন্ত আলস্য লবঙ্গ সহস্র বিলম্ব স্বতন্ত্র রচনা রটনা যোজনা কল্পনা বঞ্চনা।

ইকার আর উকার পদে পদে অকারকে অপদস্থ করে থাকে তার আরও প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত ভাষায় ঈয় প্রত্যয়ের যোগে 'জল' হয় 'জলীয়'। চলতি বাংলায় ওখানে আসে উআ প্রত্যয় : জল+উআ=জলুআ। এইটে হল প্রথম রূপ।

কিন্তু উ স্বরবর্ণ শব্দটাকে স্থির থাকতে দেয় না। তার বাঁ দিকে আছে বাংলা অ, ডান দিকে আছে আ, এই দুটোর সঙ্গে মিশে দুই দিকে দুই ওকার লাগিয়ে দিল, হয়ে দাঁড়ালো 'জোলো'।

অকারে বা অযুক্ত বর্ণে যে-সব শব্দের শেষ সেই-সব শব্দের প্রান্তে অ বাসা পায় না, তার দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়েছি। ব্যতিক্রম আছে ত প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে, যেমন : গত হত ক্ষত। আর কতকগুলি সর্বনাম ও অব্যয় শব্দে, যেমন : যত তত কত যেন কেন হেন। আর 'এক শো' অর্থের 'শত' শব্দে। কিন্তু এ কথাটাও ভুল হল। বানানের ছলনা দেখে মনে হয় অন্তত ঐ কটা জায়গায় অ বুঝি টিঁকে আছে। কিন্তু সে ছাপার অক্ষরে আপনার মান বাঁচিয়ে মুখের উচ্চারণে ওকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, হয়েছে : নতো শতো গতো ক্যানো।

অকারের অত্যন্ত অনাদর ঘটেছে বাংলার বিশেষণ শব্দে। বাংলা-ভাষায় দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দ প্রায়ই অকারান্ত হয় না। তাদের শেষে থাকে আকার একার বা ওকার। এর ব্যতিক্রম অতি অল্পই। প্রথমে সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি মনে পড়ে দেওয়া যাক। রঙ বোঝায় যে শব্দে, যেমন : লাল নীল শ্যাম। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন : টক ঝাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : এক থেকে দশ; তার পরে, বিশ ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এইরকম সংখ্যা-

বাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে খাটে, যেমন : একজন দশঘর দুইমুখো তিনহপ্তা। কিন্তু বিশেষ্য পদের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে গেলেই ওদের সঙ্গে 'টি' বা 'টা', 'খানা' বা 'খানি' যোগ করা যায়, এর অন্যথা হয় না। কখনো কখনো বা বিশেষ অর্থে ই প্রত্যয় জোড়া হয়, যেমন : একই লোক, দুইই বোকা। কিন্তু এই প্রত্যয় আর বেশি দূর চালাতে গেলে 'জন' শব্দের সহায়তা দরকার হয়, যেমন : পাঁচজনই দশজনেই। 'জন' ছাড়া অন্য বিশেষ্য চলে না; 'পাঁচ গোরুই' 'দশ চৌকিই' অবৈধ, ওদের ব্যবহার করা দরকার হলে সংখ্যাশব্দের পরে টি টা খানি খানা জুড়তে হবে, যথা : দশটা গোরুই, পাঁচখানি তক্তাই। এক দুই -এর বর্গ ছাড়া আরও দুটি দুই অক্ষরের সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, যেমন : আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও বিশেষ্যশব্দ-সহযোগে সমাসে চলে, যেমন : আধমোন দেড়পোয়া। সমাস ছাড়া বিশেষণ রূপে : দেড়া আধা। সমাসসংশ্লিষ্ট একটা শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই : জোড়হাত। সমাস ছাড়ালে হবে 'জোড়া হাত'। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটি ক্রিয়াপদের যোগে অথবা সমাসে চলে : হেঁটমুণ্ড, কিংবা হেঁট করা, হেঁট হওয়া। সাধারণ বিশেষণ অর্থে ওকে ব্যবহার করি নে, বলি নে 'হেঁট মানুষ'। বস্তুত 'হেঁট হওয়া' 'হেঁট করা' জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাঝ' শব্দটাও এই জাতের, বলি : মাঝখানে মাঝদরিয়া। এ হল সমাস। আর বলি : মাঝ থেকে। এখানে 'থেকে' অপাদানের চিহ্ন, অতএব 'মাঝথেকে' শব্দটা জোড়া শব্দ। বলি নে : মাঝ গোরু, মাঝ ঘর। এই মাঝ শব্দটা খাঁটি বিশেষণ রূপ নিলে হয় 'মেঝো'।

দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণের দৃষ্টান্ত ভেবে ভেবে আরও কিছু মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু অনেকটা ভাবতে হয়। অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না, যেমন : বড়ো ছোটো মেঝো সেজো ভালো কালো ধলো রাঙা সাদা ফিকে খাটো রোগা মোটা কুঁজো বাঁকা সিধে কানা খোঁড়া বোঁচা নুলো ন্যাকা খাঁদা ট্যারা কটা গোটা ন্যাড়া খ্যাপা

মিঠে ডাঁসা কষা খাসা তোফা কাঁচা পাকা খাঁটি মেকি কড়া চোখা রোখা ভিজে হাজা শুকো গুঁড়ো বুড়ো ওঁচা খেলো ছ্যাঁদা ঝুঁটো ভীতু উঁচু নিচু কালা হাবা বোকা ঢ্যাঙা বেঁটে ঠুঁটো ঘনো।

বাংলা বর্ণমালায় ই আর উ সবচেয়ে উদ্যমশীল স্বরবর্ণ। রাসায়নিক মহলে অক্সিজেন গ্যাস নানা পদার্থের সঙ্গে নানা বিকার ঘটিয়ে দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে, ই স্বরবর্ণটা সেইরকম। অন্তত আ'কে বিগড়িয়ে দেবার জন্যে তার খুব উদ্যম, যেমন: থলি+আ=থ'লে, করি+আ=ক'রে। ইআ প্রত্যয়ের ই পূর্ববর্তী একটা বর্ণকে ডিঙিয়ে শব্দের আদি ও অন্তে বিকার ঘটায়, তার দৃষ্টান্ত : জাল+ইআ=জেলে, বালি+ইআ=বেলে, মাটি+ইআ=মেটে, লাঠি+ইআল=লেঠেল।

পরে যেখানে আকার আছে ই সেখানে আ'এ হাত না দিয়ে নিজেকেই বদলে ফেলেছে, তার দৃষ্টান্ত যথা : মিঠাই=মেঠাই, বিড়াল=বেড়াল, শিয়াল=শেয়াল, কিতাব=কেতাব, খিতাব=খেতাব।

আবার নিজেকে বজায় রেখে আকারটাকে বিগড়িয়ে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দেখো : হিসাব=হিসেব, নিশান=নিশেন, বিকাল=বিকেল, বিলাত=বিলেত। ই কোনো উৎপাত করে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, সে বেশি নয়, অল্পই, যেমন : বিচার নিবাস কৃষাণ পিশাচ।

একদা বাংলা ক্রিয়াপদে আ স্বরবর্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। করিলা চলিলা করিবা যাইবা : এইটেই নিয়ম ছিল। ইতিমধ্যে ই উপদ্রব বাধিয়ে দিলে। নিরীহ আকারকে সে শান্তিতে থাকতে দেয় না; 'দিলা'কে করে তুলল 'দিলে', 'করিবা' হল 'করবে'।

বাংলা ক্রিয়াপদের সদ্য অতীতে ইল প্রত্যয়ে বিকল্পে ও এবং এ লাগে, যেমন : করলো করলে। 'করিল' হয়েছে 'করলো', ইকারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে। 'করিলা' থেকে 'করলে' হয়েছে ইকারের শাসন মেনেই, অর্থাৎ আ'কে নিকটে পেয়ে ই তার যোগে একটা এ

ঘটিয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, দক্ষিণবঙ্গের কথ্য বাংলার কথা বলছি। এই ভাষায় 'করিলাম' যদি 'করলেম' হয়ে থাকে সে তার স্বরবর্ণের প্রবৃত্তিবশত। এই কারণেই 'হইয়া' হয়েছে 'হয়ে'।

বাংলায় উ স্বরবর্ণও খুব চঞ্চল। ইকারি টেনে আনে এ স্বরকে, আর ও স্বরকে টানে উকার : পট+উআ=পোটো। মাঝের উ ডাইনে বাঁয়ে দিলে স্বর বদলিয়ে। শব্দের আদ্যক্ষরে যদি থাকে 'আ', তা হলে এই সব্যসাচী বাঁ দিকে লাগায় এ, ডান দিকে ও। 'মাঠ' শব্দে উআ প্রত্যয় যোগে 'মাঠুআ', হ'য়ে গেল 'মেঠো'; 'কাঠুআ' থেকে 'কেঠো'। উকারের আত্মবিসর্জনের যেমন দৃষ্টান্ত দেখলুম, তার আত্মপ্রতিষ্ঠারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : কুড়াল=কুড়ুল, উনান=উনুন। কোথাও বা আদ্যক্ষরের উকার পরবর্তী আকারকে ও ক'রে দিয়ে নিজে খাঁটি থাকে, যেমন : জুতা=জুতো, গুঁড়া= গুঁড়ো, পূজা=পুজো, সুতা=সুতো, ছুতার=ছুতোর, কুমার= কুমোর, উজাড়=উজোড়। উকারের পরবর্তী অকারকে অনেক স্থলেই উকার করে দেওয়া হয়, যেমন : পুতল=পুতুল, পুখর=পুখুর, হুকম=হুকুম, উপড়=উপুড়।

একটা কথা বলে রাখি, ইকারের সঙ্গে উকারের একটা যোগ-সাজোস আছে। তিন অক্ষরের কোনো শব্দের তৃতীয় বর্ণে যদি ই থাকে তা হলে সে মধ্যবর্ণের আ'কে তাড়িয়ে সেখানে বিনা বিচারে উ'এর আসন করে দেয়। কিন্তু প্রথমবর্ণে উ কিংবা ই থাকা চাই, যেমন : উড়ানি=উড়ুনি, নিড়ানি=নিড়ুনি, পিটানি=পিটুনি। কিন্তু 'পেটানি'র বেলায় খাটে না; কারণ ওটা একার, ইকার নয়। 'মাতানি'র বেলায়ও এইরূপ। 'খাটুনি' হয়, যেহেতু ট'এ আকারের সংস্রব নেই। গাঁথুনি মাতুনি রাঁধুনি'রও উকার এসেছে অকারকে সরিয়ে দিয়ে। সেই নিয়মে : এখুনি চিরুনি। 'চালানি' শব্দে আকারকে মেরে উকার দখল পেলে না, কিন্তু 'চালনি' শব্দে অকারকে ঠেলে ফেলে অনায়াসে হল 'চালুনি'।

উকারের ব্যবহার দেখলে মনে পড়ে কোকিলকে, সে যেখানে সেখানে পরের বাসায় ডিম পেড়ে যায়।

এও দেখা গেছে ইআ প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে ই'কে ঠেলে উ অনধিকারে নিজে আসন জুড়ে বসে, যেমন : জঙ্গল=জঙ্গলিয়া=জঙ্গুলে, বাদল=বাদলিয়া=বাদুলে। এমনিতরো : নাটুকে মাতুনে। হাতুড়ে কাঠুরে সাপুড়ে হাটুরে ঘেসুড়ে : এদের মধ্যে কোনো-একটা প্রত্যয় যোগে র বা ড় এসে জুটেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'ঘেসুড়ে'র ঘাসে লাগল একার, 'সাপুড়ে'র সাপ রইল নির্বিকার। ভাষাকে প্রশ্ন করলে এক-এক সময়ে ভালো জবাব পাই, এক-এক সময় পাইও নে। চাষ যে করে সে 'চাষুড়ে' হল না কেন।

আমার হিন্দিভাষী বন্ধু বলেন, বাংলায় 'সাপুড়ে'; হিন্দিতে : সঁপেরা=সাঁপ+হারা। বাংলা 'কাঠুরে' হিন্দিতে 'লকড়হারা', হিন্দিতে 'কাঠহারা' কথা নেই। হিন্দির এই 'হারা' তদ্ধিত প্রত্যয়; অধিকার অর্থে এর প্রয়োগ, ক্রিয়া অর্থে নয়। বোধ করি সেই কারণে 'চাষুড়ে' শব্দটা সম্ভব হয় নি।

স্বরবিকারের আর-একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখো। ইআ প্রত্যয়-যোগে একটা ওকার খামখা হয়ে গেল উ : গোবোর+ইয়া=গুব্‌রে, কোঁদোল+ইয়া=কুঁদুলে! 'কুঁদ্‌লে' হল না কেন সেও একটা প্রশ্ন। 'গোবোর' থেকে ওকারটাকে হসন্তের ঘায়ে তাড়িয়ে দিলে, 'কোঁদোল' শব্দে ও হসন্তকে জায়গা না দিয়ে নিজে বসল জমিয়ে।

অকারের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। হাত বুলিয়ে সন্ধান করাকে বলে 'হাৎড়ানো', অসমাপিকায় 'হাৎড়িয়ে'। এখানে 'হাত'এর ত থেকে ছেঁটে দেওয়া হল অকার। অথচ 'হাতুড়ে' শব্দের বেলায় নাহক একটা উকার এনে জুড়ে দিলে, তবু অকারকে কিছুতে আমল দিল না। 'বাদল' শব্দের উত্তর ইআ প্রত্যয় যোগ ক'রে 'বাদ্‌লে' করলে না বটে, কিন্তু দিলে 'বাদুলে' করে।

এই-সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারি, অন্তত পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের রসনার টান আছে উকারের দিকে। 'হাতড়ি' শব্দ তাই সহজেই হয়েছে 'হাতুড়ি'। তা ছাড়া দেখো : বাছুর তেঁতুল বামুন মিশুক হিংসুক বিষ্যুৎবার।[১]

এই প্রসঙ্গে আর-একটা দৃষ্টান্ত দেবার আছে। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের স্থলে আজকাল 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ ও বানান চলেছে। আজকাল বলছি এইজন্যে যে, আমার নিজের কাছে এই উচ্চারণ ছিল অপরিচিত ও অব্যবহৃত। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের মূলরূপ : চিবাইতে ঘুমাইতে। আ+ই'কে ঠেলে ফেলে নিঃসম্পর্কীয় উ এসে বসল। অবশ্য এর অন্য নজির আছে। বিনানি=বিনুনি, ঝিমানি=ঝিমুনি, পিটানি=পিটুনি শব্দে দেখা যাচ্ছে প্রথম বর্ণের ইকার তার সবর্ণ তৃতীয় বর্ণের 'পরে হস্তক্ষেপ করলে না, অথচ মধ্যবর্ণের আ'কে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে উ। মনে রাখতে হবে, প্রথম বর্ণের ইকার তার এই বন্ধু উ'কে নিমন্ত্রণের জন্যে দায়ী। গোড়ায় যেখানে ইকারের ইঙ্গিত নেই সেখানে উ পথ পায় না ঢুকতে। পূর্বেই তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। 'ঠ্যাঙানি' হয় না 'ঠেঙুনি', 'ঠকানি' হয় না 'ঠকুনি', 'বাঁকানি' হয় না 'বাঁকুনি'। 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ আমার কানে ঠিক ব'লে ঠেকে না, সে যে নিতান্ত কেবল অভ্যাসের জন্যে তা আমি মানতে পারি নে। বাংলা ভাষায় এ উচ্চারণ অনিবার্য নয়। আমার বিশ্বাস 'চিনাইতে' শব্দকে কেউ 'চিনুতে' বলে না, অন্তত আমার তাই ধারণা। 'দুলাইতে' কেউ কি 'দুলুতে', কিংবা 'ছুটাইতে' 'ছুটুতে' বলে? 'বুঝাইতে' বলতে 'বুঝুতে' কেউ বলে কি না নিশ্চিত জানি

১ হিন্দিতে 'হাতুড়ি' শব্দের প্রতিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'হতৌড়ি'। বিহারীতে স্ত্রীলিঙ্গে 'হতউরি'। ঔড়া এবং উরা প্রত্যয় থেকে উকারের প্রবেশ স্বাভাবিক। হিন্দিতেও হ্রস্ব ওকারকে উকারের মতো বলবার ও লেখবার প্রবৃত্তি আছে : বোলবানা=বুলবানা, ফোড়বানা=ফুড়বানা, গোবর+ঐলা=গুবরৈলা।

নে, আশা করি বলে না। 'পুরাইতে' বলতে 'পুরুতে' কিংবা 'ঠকাইতে' বলতে 'ঠকুতে' শুনি নি। আমার নিশ্চিত বোধ হয় 'কান জুড়ুল' কেউ বলে না, অথচ 'ঘুমাইল' ও 'জুড়াইল' একই ছাঁদের কথা। 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনাইল' বাক্যটাকে চলতি ভাষায় যদি বলে 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনুল', আমার বোধ হয় সেটা বেআড়া শোনাবে। এই 'শোনাবে' শব্দটা 'শুনুবে' হয়ে উঠতে বোধ হয় এখনো দেরি আছে। আমরা এক কালে যে-সব উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলুম এখন তার অন্যথা দেখি, যেমন : পেতোল (পিতোল), ভেতোর (ভিতোর), তেতো (তিতো), সোন্দোর (সুন্দোর), ডাল দে (দিয়ে) মেখে খাওয়া, তার বে (বিয়ে) হয়ে গেল।

উকারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হতে পারে, এতে আশ্চর্যের কথা নেই, যেমন : মুণ্ডু কুণ্ডু শুদ্দুর রুদ্দুর পুত্তুর মুগুর। তবু 'কুণ্ডল' ঠিক আছে, কিন্তু 'কুণ্ডুলি'তে লাগল উকার। 'সুন্দর' 'সুন্দরী'তে কোনো উৎপাত ঘটে নি। অথচ 'গণনা' শব্দে অনাহূত উকার এসে বানিয়ে দিলে 'গুনে'। 'শয়ন' থেকে হল 'শুয়ে', 'বয়ন' থেকে 'বুনে', 'চয়ন' থেকে 'চুনে'।

বাংলা অকারের প্রতি বাংলা ভাষার অনাদরের কথা পূর্বেই বলেছি। ইকার-উকারের পূর্বে তার স্বরূপ লোপ হয়ে ও হয়। ঐ নিরীহ স্বরের প্রতি একারের উপদ্রবও কম নয়। উচ্চারণে তার একটা অকার-তাড়ানো ঝোঁক আছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাধারণ লোকের মুখের উচ্চারণে। বাল্যকালে প্রলয়-ব্যাপারকে 'পেল্লায়' ব্যাপার বলতে শুনেছি মেয়েদের মুখে। সমাজের বিশেষ স্তরে আজও এর চলন আছে, এবং আছে : পেল্লাদ (প্রহ্লাদ), পেরনাম (প্রণাম), পেরথম (প্রথম), পেরধান (প্রধান), পেরজা (প্রজা), পেসোন্নো (প্রসন্ন), পেসাদ অথবা পেরসাদ (প্রসাদ)। 'প্রত্যাশা' ও 'প্রত্যয়' শব্দের অপভ্রংশে প্রথম বর্ণে হস্তক্ষেপ না ক'রে দ্বিতীয় বর্ণে বিনা কৈফিয়তে একার নিয়েছে বাসা, হয়েছে 'পিত্তেস',

'পিত্তেয়', কখনো হয় 'পেত্তয়'। একারকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ইকার এবং ঋকার, তারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : সেদ্ধো (সিদ্ধ), নেত্তো (নিত্য বা নৃত্য), কেষ্টো (কিষ্টো), শেকোল (শিকল), বেরোদ (বৃহৎ), খেস্টান (খৃস্টান)। প্রথম বর্ণকে ডিঙিয়ে মাঝ-খানের বর্ণে একার লাফ দিয়েছে সেও লক্ষ্য করবার বিষয়, যেমন : নিশ্বেস বিশ্বেস, সরেস (সরস), নীরেস ঈশেন বিলেত বিকেল অদেষ্ট।

স্বরবর্ণের খেয়ালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।—

'পিটানো' শব্দের প্রথম বর্ণের ইকার যদি অবিকৃত থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের আকারকে দেয় ওকার করে, হয় 'পিটোনো'। ইকার যদি বিগড়ে গিয়ে একার হয় তা হলে আকার থাকে নিরাপদে, হয় 'পেটানো'। তেমনি : মিটোনো=মেটানো, বিলোনো=বেলানো, কিলোনো=কেলানো। ইকারে একারে যেমন অদল-বদলের সম্বন্ধ তেমনি উকারে ওকারে। শব্দের প্রথম বর্ণে উ যদি খাঁটি থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের অকারকে পরাস্ত ক'রে করবে ওকার। যেমন 'ভুলানো' হয়ে থাকে 'ভুলোনো'। কিন্তু যদি ঐ উকারের স্খলন হয়ে হয় ওকার তা হলে আকারের ক্ষতি হয় না, তখন হয় 'ভোলানো'। তেমনি : ডুবোনো=ডোবানো, ছুটোনো=ছোটানো। কিন্তু 'ঘুমোনো' কখনোই হয় না 'ঘোমানো', 'কুলোনো' হয় না 'কোলানো' কেন। অকর্মক বলে কি ওর স্বতন্ত্র বিধান।

দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।

স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋ'কে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জন বর্ণের রি। সেইজন্যে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন 'মাত্রিভূমি'। যে কবি তাঁর ছন্দে ঋকারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের রসনা ঠোকর খায়।

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন 'জল'। এখানে জ'এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হয় 'জলা' শব্দের জ'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা'য় প্রথমটির হা দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর 'ভুতো', 'ঘোল' আর 'ঘোলা'— তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন : ভা—রি তো পণ্ডিত, কে—বা কার খোঁজ রাখে, আ—জই যাব, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রো লোক, কী—যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও মার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।

বাংলায় একটা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ আছে যা সংস্কৃত ভাষায় নেই। বর্ণমালায় সে ঢুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে, তার জন্যে স্বতন্ত্র আসন পাতা হয় নি। ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়। বাংলায় তার বিশেষ বানান করবার সময় আমরা য ফলায় আকার দিয়ে থাকি। বাংলায় আমরা যেটাকে বলি অন্তস্থ য, চ বর্গের জ'এর সঙ্গে তার উচ্চারণের ভেদ নেই। য'এর নীচে ফোঁটা দিয়ে আমরা আর-একটা অক্ষর বানিয়েছি তাকে বলি ইয়। সেটাই সংস্কৃত অন্তস্থ য। সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে 'যম' শব্দ 'য়ম'। কিন্তু ওটাতে 'জম' উচ্চারণের অজুহাতে য়'র ফোঁটা দিয়েছি সরিয়ে। 'নিয়ম' শব্দের বেলায় য়'র ফোঁটা রক্ষে করেছি, তার উচ্চারণেও সংস্কৃত বজায় আছে। কিন্তু যফলা-আকারে (্যা) য়'কে দিয়েছি খেদিয়ে আর আ'টাকে দিয়েছি বাঁকা করে। সংস্কৃতে 'ন্যাস' শব্দের উচ্চারণ 'নিয়াস', বাংলায় হল nas. তার পর থেকে দরকার পড়লে য ফলার চিহ্নটাকে ব্যবহার করি আকারটাকে বাঁকিয়ে দেবার জন্যে।

Paris শব্দকে বাংলায় লিখি 'প্যারিস,' সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল 'পিয়ারিস'। একদা 'ন্যায়' শব্দটাকে বাংলায় 'নেয়ায়' লেখা হয়েছে দেখেছি।

অথচ 'ন্যায়' শব্দকে বানানের ছলনায় আমরা তৎসম শব্দ বলে চালাই। 'যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্ভব বাংলা।

সংস্কৃত শব্দের একার বাংলায় অনেক স্থলেই স্বভাব পরিবর্তন করেছে, যেমন 'খেলা', যেমন 'এক'। জেলাভেদে এই 'এ'কারের উচ্চারণ একেবারে বিপরীত হয়। তেল মেঘ পেট লেজ— শব্দে তার প্রমাণ আছে।

পূর্বেই দেখিয়েছি আ এবং বাংলা অ স্বরবর্ণ সম্বন্ধে ইকার এবং উকারের ব্যবহার আধুনিক খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যজনক, অর্থাৎ এরা সর্বদা অপঘাত ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এদের অনুগত একারের প্রতি এরা সদয়। 'এক' কিংবা 'একটা' শব্দের এ গেছে বেঁকে, কিন্তু উ তাকে রক্ষা করেছে 'একুশ' শব্দে। রক্ষা করবার শক্তি আকারের নেই, তার প্রমাণ 'এগারো' শব্দে। আমরা দেখিয়েছি ন'এর পূর্বে অ হয়ে যায় ও, যেমন 'ধন' 'মন' শব্দে। ঐ ন একারের বিকৃতি ঘটায় : ফেন সেন কেন যেন। ইকারের পক্ষপাত আছে একারের প্রতি, তার প্রমাণ দিতে পারি। 'লিখন' থেকে হয়েছে 'লেখা'—বিশুদ্ধ এ— 'গিলন' থেকে 'গেলা'। অথচ 'দেখন' থেকে 'দ্যাখা' 'বেচন' থেকে 'ব্যাচা,' 'হেলন' থেকে 'হ্যালা'। অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এদের বিশেষ রূপগ্রহণের মূল পাওয়া যায়, যেমন : লিখিয়া=লেখা (পূর্ববঙ্গে 'ল্যাখা'), গিলিয়া=গেলা। কিন্তু : খেলিয়া=খ্যালা, বেচিয়া=ব্যাচা। মিলন অর্থে আর-একটা শব্দ আছে 'মেলন,' তার থেকে হয়েছে 'ম্যালা,' আর 'মিলন' থেকে হয়েছে 'মেলা' (মিলিত হওয়া)।

য ফলায় আকার না থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ অ্যাকার,

যেমন 'ব্যয়' শব্দে। এটা হল আদ্যক্ষরে। অন্যত্র ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন 'সভ্য'। পূর্বে বলেছি ইকারের প্রতি একারের টান। 'ব্যক্তি' শব্দের ইকার প্রথম বর্ণে দেয় একার বসিয়ে, 'ব্যক্তি' শব্দ হয়ে যায় 'বেক্তি'। হ'এর সঙ্গে য ফলা যুক্ত হলে কোথা থেকে জ'এ-ঝ'এ জটলা ক'রে হয়ে দাঁড়ায় 'সোজ্‌ঝো'। অথচ 'সহ্য' শব্দটাকে বাঙালি তৎসম বলতে কুণ্ঠিত হয় না। বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফল হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

য ফলার উচ্চারণ বাংলায় কোথাও সম্মানিত হয় নি, কিন্তু এক কালে বাংলার ক্রিয়াপদে পথ হারিয়ে সে স্থান পেয়েছিল। 'খাইল' 'আইল'. শব্দের 'খাল্য' 'আল্য' রূপ প্রাচীন বাংলায় দেখা গিয়েছে। ইকারটা শব্দের মাঝখান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে শেষকালে গিয়ে পড়াতে এই ইঅ'র সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলার অন্য প্রদেশে এই যফলা-আকারের অভাব নেই, যেমন 'মায়্যা মানুষ'। বাংলা সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদে যফলা-আকার ছদ্মবেশে আছে, যেমন : হইয়া খাইয়া। প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে তার বানান দেখা যায় : হয়্যা খায়্যা।

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে। 'যাওয়া খাওয়া পাওয়া দেওয়া নেওয়া' ধাতু 'যেতে খেতে পেতে দিতে নিতে' আকার নিয়ে থাকে, কিন্তু 'গাওয়া বাওয়া চাওয়া কওয়া বওয়া' কেন তেমনভাবে হয় না 'গেতে বেতে চেতে ক'তে ব'তে'। এর যে উত্তর আমার মনে এসেছে সে হচ্ছে এই যে, যে ধাতুতে হ'এর প্রভাব আছে তার ই লোপ হয় না। 'গাওয়া'র হিন্দি প্রতিশব্দ 'গাহনা,' 'চাওয়া'র 'চাহনা,' 'কওয়া'র 'কহনা'। কিন্তু 'খানা দেনা লেনা'র মধ্যে হ নেই। 'বাহন' থেকে

'বাওয়া,' সুতরাং তার সঙ্গে হ'এর সম্বন্ধ আছে। 'ছাদন' ও 'ছাওয়া'র মধ্যপথে বোধকরি 'ছাহন' ছিল, তাই 'ছাইতে'র জায়গায় 'ছেতে' হয় না।

স্বরবর্ণের অনুরাগ-বিরাগের সূক্ষ্ম নিয়মভেদ এবং তার স্বৈরাচার কৌতুকজনক। সংস্কৃত উচ্চারণে যে নিয়ম চলেছিল প্রাকৃতে তা চলল না, আবার নানা প্রাকৃতে নানা উচ্চারণ। বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা ব'লে চেনাই শক্ত। আগে বলত 'পড়ই,' এখন বলে 'পড়ে'; 'হোহু' হয়ে গেছে 'হও'; 'আম্মহি' হল 'আমি'; 'বাম্‌হন' হল 'বামুন'। এই বদল হওয়ার ঝোঁক বহু লোককে আশ্রয় ক'রে এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সজীব পদার্থ। হয়তো এই মুহূর্তেই আমাদের উচ্চারণ তার কক্ষপথ থেকে অতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ফ হচ্ছে f, ভ হচ্ছে ব, চ হচ্ছে স, এখনো কানে স্পষ্ট ধরা পড়ছে না।

যে প্রাচীন প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা প্রাকৃতের নিকটসম্বন্ধ তার রঙ্গভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জন্মান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অনুসরণ করে এলে অপভ্রংশের কতকগুলি বাঁধা রীতি হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। খবর নিতে হলে যেতে হবে সুনীতিকুমারের দ্বারে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে রসনার প্রকৃতিগত কোনো সাধারণ নিয়ম বের করা কঠিন হবে। কেননা দেখা যাচ্ছে, পূর্ব উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে অনেক স্থলে কেবল যে উচ্চারণের পার্থক্য আছে তা নয়, বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়।

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণবিকার নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছি আমার বাংলা শব্দতত্ত্বে।১

স্বরবর্ণ সম্বন্ধে পালা শেষ করার পূর্বে একটা কথা বলে নিই। এর পরে প্রত্যয় সম্বন্ধে যেখানে বিস্তারিত করে বলেছি সেখানটা

১ শব্দতত্ত্ব : রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড।

পড়লে পাঠকরা জানতে পারবেন বাংলা ভাষাটা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা।

বাংলায় এ ও উ এই তিনটে স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়। সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভঙ্গী তৈরি করে। 'হরি'কে যখন 'হরে' বলি কিংবা 'কালী'কে বলি 'কেলো', তখন সেটা সম্মানের সম্ভাষণ বলে শোনাবে না। কিন্তু 'হরু' বা 'কালু', 'ভুলু' বা 'খুকু', এমন-কি 'খাঁদু' শব্দে স্নেহ বহন করে। পূর্বে দেখানো হয়েছে বাংলা ই এবং উ স্বরটা সম্মানী, এ এবং ও অন্ত্যজ। আ স্বরটা অনাদৃত, ওর ব্যবহার আছে অনাদরে, যেমন : মাখন=মাখ্না, মদন=মদ্না, বামন=বাম্না। ইংরেজিতে 'রবর্ট' থেকে 'বর্টি', 'এলিজাবেথ' থেকে 'লিজি', 'মার্গারেট' থেকে 'ম্যাগি', 'উইলিয়ম' থেকে 'উইলি', 'চার্ল্‌স্' থেকে 'চার্লি'— ইকার স্বরে দেয় আত্মীয়তার টান। ইকারে আদর প্রকাশ বাংলাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আকারকে ঠেলে দিয়ে ই এসে বসে, যেমন : লতা=লতি, কণা=কনি, ক্ষমা=ক্ষেমি, সরলা=সর্‌লি, মীরা=মীরি। অকারান্ত শব্দেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন : স্বর্ণ=স্বর্নি। এগুলি সব মেয়ের নাম। আই যোগেও আদরের সুর লাগে, যেমন : নিমাই নিতাই কানাই বলাই। এ কিংবা ও স্বরের অবজ্ঞা, উ স্বরের স্নেহব্যঞ্জনা সংস্কৃতে পাই নে।

বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার, আর কতকগুলো আছে যারা বেগার খাটে অর্থাৎ নিজের কর্তব্য ছেড়ে অন্যের কাজে লাগে। ক বর্গের অনুনাসিক ঙ সাধু ভাষায় যুক্ত-বর্ণে ছাড়া অন্যত্র আপন গৌরবে স্থান পায় নি। যেখানে রসনায় তার উচ্চারণকে স্বীকার করেছে সেখানে লেখায় উপেক্ষা করেছে তার স্বরূপকে। 'রক্তবর্ণ' বলতে বোঝায় যে শব্দ তাকে লেখা হয়েছে 'রাঙ্গা', অর্থাৎ তখনকার ভদ্রলোকেরা ভুল বানান করতে রাজি ছিলেন কিন্তু ঙ'র বৈধ দাবি কিছুতে মানতে চান নি। বানান-জগতে আমিই বোধ হয় সবপ্রথমে ঙ'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেম, সেও

বোধ করি ছন্দের প্রতি মমতাবশত। যেখানে 'ভাঙ্গা' বানান ছন্দকে ভাঙে সেখানে ভাঙন রক্ষা করবার জন্যে ঙ'র শরণ নিয়ে লিখেছি 'ভাঙা'। কিন্তু চ বর্গের ঞ'র যথোচিত সদ্গতি করা যায় নি। এই ঞ অন্য ব্যঞ্জনবর্ণকে আঁকড়িয়ে টিঁকে থাকে, একক নিজের জোরে কোথাও ঠাঁই পায় না। ঐ 'ঠাঁই' কথাটা মনে করিয়ে দিলে যে, এক কালে ঞ ছিল ঐ শব্দটার অবলম্বন। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক শব্দ পাওয়া যায় অন্তিমে যার ঞ'ই ছিল আশ্রয়, যেমন : নাঞি মুঞি খাঞা হঞা। এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্রেই ঞা'র প্রভুত্ব ছিল। আমার বিশ্বাস, এটা রাঢ়দেশের লেখক ও লিপিকরদের অভ্যস্ত ব্যবহার। অনুনাসিক বর্জনের জন্যেই পূর্ব-বঙ্গ বিখ্যাত।

বাংলা বর্ণমালায় আর-একটা বিভীষিকা আছে, মূর্ধন্য এবং দন্ত্য ন'এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। মূর্ধন্য ণ'এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। কেউ কেউ বলেন, ওটা মূলত দ্রাবিড়ি। ওড়িয়া ভাষায় এর প্রভাব দেখা যায়। ড়'এ চন্দ্রবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ। খাঁড়া চাঁড়াল ভাঁড়ার প্রভৃতি শব্দে ওর পরিচয় পাওয়া যায়।

ল কলকাতা অঞ্চলে অনেক স্থলে নকার গ্রহণ করে, যেমন : নেওয়া নুন নেবু, নিচু (ফল), নাল (লালা), নাগাল নেপ ন্যাপা, নোয়া (সধবার হাতের), ন্যাজ, নোড়া (লোষ্ট্র), ন্যাংটা (উলঙ্গ)। কাব্যের ভাষায় : করিনু চলিনু। গ্রাম্য ভাষায় : নাটি, ন্যাকা (লেখা), নাল (লাল বর্ণ), নঙ্কা ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ ষ স। কিন্তু সবক'টির অস্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে। ওরা বাঙালি শিশুদের বর্ণপরিচয়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছে। উচ্চারণ ধ'রে দেখলে আছে এক তালব্য শ। আর বাকি দুটো আসন দখল করেছে সংস্কৃত অভিধানের দোহাই পেড়ে। দন্ত্য স'এর উচ্চারণ অভিধান

অনুসারে বাংলায় নেই বটে, কিন্তু ভাষায় তার দুটো-একটা ফাঁক জুটে গেছে। যুক্তবর্ণের যোগে রসনায় সে প্রবেশ করে, যেমন : স্নান হস্ত কাস্তে মাস্তুল। শ্রী মিশ্র অশ্রু : তালব্য শ'এর মুখোষ পরেছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত্য স'এর। সংস্কৃতে যেখানে র ফলার সংস্রবে এসেছে তালব্য শ, বাংলায় সেখানে এল দন্ত্য স। এ ছাড়া 'নাচতে' 'মুছতে' প্রভৃতি শব্দে চ-ছ'এর সঙ্গে ত'এর ঘেঁষ লেগে দন্ত্য স'এর ধ্বনি জাগে।

সংস্কৃতে অন্তঃস্থ, বর্গীয়, দুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব'এর ব্যবহার। হাওয়া খাওয়া প্রভৃতি ওয়া-ওয়ালা শব্দে অন্তঃস্থ ব'এর আভাস পাওয়া যায়। আসামি ভাষায় এই ওয়া অন্তঃস্থ ব দিয়েই লেখে, যেমন : 'হওয়া'র পরিবর্তে 'হবা'। হ এবং অন্তঃস্থ ব'এর সংযুক্ত বর্ণেও রসনা অন্তঃস্থ ব'কে স্পর্শ করে, যেমন : আহ্বান জিহ্বা।

বাংলা বর্ণমালার সবপ্রান্তে একটি যুক্তবর্ণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা করবার সময় তাকে বলা হয় : ক'এ মূর্ধন্য ষ 'ক্ষিয়ো'। কিন্তু তাতে না থাকে ক, না থাকে মূর্ধন্য ষ। শব্দের আরম্ভে সে হয় খ; অন্তে মধ্যে দুটো খ'এ জোড়া ধ্বনি, যেমন 'বক্ষ'। এই ক্ষ'র একটা বিশেষত্ব দেখা যায়, ইকারের পূর্বে সে একার গ্রহণ করে, যেমন : ক্ষেতি ক্ষেমি ক্ষেপি। তা ছাড়া আকার হয় য্যাকার, যেমন : 'ক্ষান্ত' হয় 'খ্যান্তো'; কারও কারও মুখে 'ক্ষমা' হয় 'খ্যামা'।

১৩

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চলতি ভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার

আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে যেগুলোর স্বতন্ত্র কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগ্‌ন্যাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেইরকম সিগ্‌ন্যাল। কোনোটাতে আছে নিষেধ, কোনোটা দেখায় এগোবার পথ, কোনোটা বাইরের পথ, কোনোটা নীচের দিকে, কোনোটা উপরের দিকে, কোনোটা চার দিকে, কোনোটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে আ উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিক্; নির্ জুড়ে দিলে হয় 'নির্গত', দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক; অনু জুড়ে দিলে হয় 'অনুগত', দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক; তেমনি 'সংগত' 'দুর্গত' 'অপগত' প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো। উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ তৈরি করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।

শব্দগড়নের কাজে বাংলাতেও কতকগুলো প্রত্যয় পাওয়া যায়। তার একটার দৃষ্টান্ত অন, যার থেকে হয়েছে : চলন বলন গড়ন ভাঙন। এরই সহকারী আ প্রত্যয়, যার থেকে পাওয়া যায় বিশেষ্য পদে : চলা বলা গড়া ভাঙা। এই প্রত্যয়টা বাংলায় সবচেয়ে সাধারণ, প্রায় সব ক্রিয়াতেই এদের জোড়া যায়। এই আ প্রত্যয় বিশেষণেও লাগে, যেমন : ঠেলা গাড়ি, ভাঙা রাস্তা। কিন্তু তি দিয়ে একটা প্রত্যয় আছে যেটা বিশেষভাবে বিশেষণেরই, যেমন : চলতি গাড়ি, কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন। মুশকিল এই যে, সব জায়গাতেই কাজে লাগাতে পারি নে, কেন পারি নে তারও স্পষ্ট কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। 'গড়তি টেবিল' কিংবা 'কথা-কইতি খোকা' বলতে মুখে বাধে, এর কোনো সংগত কারণ ছিল না। কাজ চালাবার জন্যে অন্য কোনো প্রত্যয় খুঁজতে হয়, সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

যে টেবিল গড়া চলছে তাকে সংস্কৃতে বোধ হয় 'সংঘটমান' বলা চলে, কিন্তু বাংলায় কিছু হাৎড়ে পাই নে। যে খোকা কথা কয় ইএ প্রত্যয়ের সাহায্যে তাকে 'কথা-কইয়ে' বলা যেতে পারে। অথচ ঐ প্রত্যয় দিয়ে 'হাসিয়ে' 'কাঁদিয়ে' বলা নিষিদ্ধ। কাঁদার বেলায় আর-এক প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায় উনে, বলি 'কাঁদুনে'। কিন্তু 'হাসুনে' বললে হাসির উদ্রেক হবে। অথচ 'নাচুনে' চলতে পারে। 'দৌড়ুনে' কথার দরকার আছে কিন্তু বলা হয় না, কেউ যদি সাহস ক'রে বলে খুশি হব। 'দ্রুতধাবনশীল ঘোড়া'র চেয়ে 'জোরে-দৌড়ুনে ঘোড়া' কানে ভালোই শোনায়। এই শব্দগুলোর প্রত্যয়টাকে ঠিক উনে বলা চলবে না; 'নাচুনে' শব্দের গোড়া হচ্ছে : নাচন+ইয়া=নাচনিয়া। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ই এবং আ'কে উ এবং এ করে দিয়েছে, হয়ে উঠেছে 'নাচুনে'। এই কথাটা মনে ক'রে কৌতুক লাগে যে, দুটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে কোথা থেকে উ এবং এ যায় জুটে।

সংস্কৃতে প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ফাঁকি দেয়। বেসুর-বিশিষ্টকে বলি 'বেসুরা' (চলতি উচ্চারণ 'বেসুরো') : সুর-বিশিষ্টকে বলি নে 'সুরা' বা 'সুরো', আর কী বলি তাও তো ভেবে পাই নে। 'সুরেলা গলা' হয়তো বলে থাকি জানি নে. অন্তত বলতে দোষ নেই। বালি-বিশিষ্টকে বলি 'বালিয়া', অপভ্রংশে 'বেলে'; কিন্তু চিনি-বিশিষ্টকে বলব না 'চিনিয়া' বা 'চিনে', চিন-দেশজ বাদামকে 'চিনে বাদাম' বলতে আপত্তি করি নে।

অনা প্রত্যয়-যোগে হয় 'পাও' থেকে 'পাওনা', 'গাও' থেকে 'গাওনা'। কিন্তু 'ধাও' থেকে 'ধাওনা' হয় না। অন্য প্রত্যয় যোগে হতে পারে 'ধাওয়াই'। 'কুট' থেকে হয় 'কোটনা'; 'ফুট' থেকে 'ফুটকি' হয়, 'ফোটনা' হয় না। 'বাঁটা' থেকে 'বাঁটনা' হয়; 'ছাঁটা' থেকে 'ছাঁটাই' হবে, 'ছাঁটনা হবে না।

সংস্কৃতে মৎ প্রত্যয় কোথাও 'মান' কোথাও 'বান' হয়, কিন্তু তার নিয়ম পাকা। সেই নিয়ম মেনে যেখানে দরকার 'মান' বা 'বান'

লাগিয়ে দেওয়া যায়। সংস্কৃতে 'শক্তিমান' বলব, 'ধনবান' বলব; বাংলায় একটাকে বলব 'জোরালো' আর-একটাকে 'টাকাওয়ালা'। অন্য ভাষাতেও ভাষার খেয়াল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কম। যেমন ইংরেজিতে আছে: হেল্‌থি ওয়েল্‌থি প্লাকি লাকি ওয়েটি স্টিকি মিস্টি ফগি। কিন্তু 'কারেজি' নয়, 'কারেজিয়স'। তবু একটা নিয়ম পাওয়া যায়। এক সিলেব্‌ল্‌'এর হালকা কথায় প্রায় সর্বত্রই বিশিষ্ট অর্থে y লাগে, বড়ো মাত্রার কথায় এই প্রত্যয় খাটে না।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষাতেও প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ, আর তাদের নিয়ম ও ব্যতিক্রমে পাল্লা চলেছে, কে হারে কে জেতে।

সংস্কৃতে আছে ত প্রত্যয়-যুক্ত 'বিকশিত পুষ্প', বাংলায় 'ফোটা ফুল'। বুক-ফাটা কান্না, চুল-চেরা তর্ক, মন-মাতানো গান, নুয়ে-পড়া ডাল, কুলি-খাটানো ব্যাবসা: এই দৃষ্টান্তগুলোতে পাওয়া যায় আ প্রত্যয়, আনো প্রত্যয়। কাজ চলে, কিন্তু এর চেয়ে আর-একটু জটিল হলে মুশকিল বাধে। 'অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা' খাস বাংলায় সহজে বলবার জো নেই।

কিন্তু এ কথাও জেনে রাখা ভালো, খাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কৌশল কথ্য বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধুধু করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ: মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে: উস্‌খুস্‌ নিস্‌পিস্‌ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরি-পাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।

বাংলায় আর-একরকম শব্দদ্বৈত আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তারা যতটা বলে তার চেয়ে আঙুল দেখিয়ে দেয়

বেশি। সংস্কৃতে আছে, ‘পতনোন্মুখ’, বাংলায় বলে ‘পড়ো-পড়ো’। সংস্কৃতে যা ‘আসন্ন’ বাংলায় তা ‘হব-হব’। সেইরকম : গেল-গেল, যায়-যায়। সংস্কৃতে যা ‘বাষ্পাকুল’ বাংলায় তা ‘কাঁদো-কাঁদো’। সংস্কৃতে বলে ‘অবরুদ্ধস্বরে’, বাংলায় বলে ‘বাধো-বাধো গলায়’। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—

যাব-যাব করে, চরণ না সরে,
ফিরে-ফিরে চায় পিছে,
পড়ো-পড়ো জলে ভরো-ভরো চোখ
শুধু চেয়ে থাকে নীচে।

ঠিক এরকম একটুকরো রেখালেখ্য এই বাধো-বাধো ভাষাতেই বানানো চলে। বাংলায় বর্ণনার ছবিকে স্পষ্ট করবার জন্যেই এই-যে অস্পষ্ট ভাষার কায়দা, এর কথা বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় আরও বিস্তারিত করে বলেছি।[১]

বাংলায় কোনো কোনো প্রত্যয় অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম ক’রে এইরকম ইঙ্গিতের দিকে পৌঁচেছে, তার উল্লেখ করা যাক : কিপ্‌টেমো ছিব্‌লেমো ছেলেমো জ্যাঠামো ঠ্যাঁটামো ফাজ্‌লেমো বিট্‌লেমো পেজোমো হ্যাংলামো বোকামো বাঁদ্‌রামো গোঁড়ামো মাৎলামো গুণ্ডামো।

সংস্কৃতের কোন্‌ প্রত্যয়ের সঙ্গে এর তুলনা করব? ত্ব প্রত্যয় দিয়ে ‘কিপ্‌টেমো’কে ‘কিপ্‌টেত্ব’ বলা যেতে পারে। কিন্তু ত্ব প্রত্যয় নির্বিকার, ভালো-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় জড়-অজড়ে ভেদ করে না। অথচ উপরের ফর্দটা দেখলেই বোঝা যাবে, শব্দগুলো একেবারেই ভদ্রজাতের নয়। গাল-বর্ষণের জন্যেই যেন পাঁকের পিণ্ড জমা করা হয়েছে। ঐ মো বা আমো প্রত্যয়ের যোগে ‘বাঁদরামো’ বলি, কিন্তু ‘সিংহমো’ বলি নে। ‘কিপ্‌টেমো’ হল, ‘দাতামো’ হল না।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

'পেজোমো' বলা চলে অনায়াসে, কিন্তু 'সেধোমো' (সাধুত্ব) বলতে বাধে। একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ ক'রে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।

আর-একটা প্রত্যয় দেখো, পনা : বুড়োপনা ন্যাকাপনা ছিব্‌লে-পনা আদুরেপনা গিন্নিপনা। সবগুলোর মধ্যেই কটাক্ষপাত। ব্যাকরণের প্রত্যয়ের যেরকম ভেদবিচার হওয়া উচিত, এ একেবারেই তা নয়। চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিরুদ্ধ দলকে খোঁচা দেবার জন্যেই এগুলো যেন বিশেষ করে শান-দেওয়া।

আনা প্রত্যয়টা দেখো: বাবুআনা বিবিআনা সায়েবিআনা নবাবিআনা মুরুব্বিআনা গরিবিআনা। বলা বাহুল্য, এর ভাবখানা একেবারেই ভালো নয়। ঐ যে 'গরিবিআনা' শব্দটা বলা হয়েছে, ওর মধ্যেও কপট অহংকারের ভাণ আছে। যদি বলা যায় 'সাধু-আনা' তা হলে বুঝতে হবে সেটা সত্যিকার সাধুত্ব নয়।

এই জাতের আর-একটা প্রত্যয় আছে, গিরি। তার সঙ্গে প্রায় 'ফলাতে' কথার যোগ হয়: বাবুগিরি গুরুগিরি সাধুগিরি দাতা-গিরি। এতে ভাণ করা, মিথ্যে অহংকার করা বোঝায়।

আরও একটা প্রত্যয় দেখা যাক, অনি বা আনি : বকুনি ধমকানি ছিঁচ্‌কাঁদুনি শাসানি হাঁপানি নাকানি-চোবানি জ্বলুনি কাঁপুনি মুখ-বাঁকানি খ্যাঁকানি লোক-হাসানি ফোঁপানি গ্যাঙানি ভ্যাঙানি ঘ্যাঙানি খিঁচুনি ছট্‌ফটানি কুট্‌কুটুনি ফোস্‌ফোঁসানি। এর সব-গুলিই গালদেওয়া শব্দ নয়, কিন্তু অপ্রিয়। হাসিটা তো ভালো জিনিস, কিন্তু আনি প্রত্যয় দিয়ে হল 'লোক-হাসানি', হাসির গুণটা গেল বিগড়িয়ে। ছাঁকুনি নিড়ুনি বিনুনি চাটনি শব্দ বস্তুবাচক, সেইজন্যে তাদের মধ্যে নিন্দার ঝাঁজ প্রবেশ করতে পারে নি।

ইআ [বিকারে 'এ'] প্রত্যয়টা যখন বস্তুসূচক না হয়ে ভাবসূচক হয়, তখন তার ইঙ্গিতে কোথাও সুখের বা শ্রদ্ধার আভাস পাব না। যেমন : নড়্‌বড়ে নিড়্‌বিড়ে খিট্‌খিটে কট্‌মটে টন্‌টনে কন্‌কনে

মিন্‌মিনে প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে ভ্যাজ্‌ভেজে ভ্যাদ্‌ভেদে ম্যাজ্‌মেজে ম্যাড়্‌মেড়ে জব্‌জবে খস্‌খসে জ্যাল্‌জেলে। সামান্য কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে, 'জব্‌ল্‌জব্‌লে' 'টুক্‌টুকে'; সংখ্যা বেশি নয়।

এবার দেখা যাক উআ'র বিকারে 'ও' প্রত্যয় : ঘেয়ো বেতো জেবারো নুলো টেকো জেঁকো গুঁফো কুনো বুনো পেঁকো, ফোতো (বাবু), রোথো খেলো ভেতো, খেগো (পোকায়)। এগুলোও সুবিধের নয়; হয় তুচ্ছ নয় পীড়াকর। ভাত যে খায় সে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু কাউকে যদি বলি 'ভেতো' তবে তাকে সম্মান করা হয় না। জীবমাত্রই খাদ্যপদার্থ ব্যবহার করে, সেটা দোষের নয়; কিন্তু কোনো-একটা খাদ্যের সম্পর্কে কাউকে যদি বলা হয় 'খেগো' তা হলে বুঝতে হবে সেই খাদ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞার কারণ আছে। যথাস্থানে যথাপরিমাণে জল উপাদেয়, কিন্তু যাকে বলি 'জোলো' তার মূল্য বা স্বাদের সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া হয়।

মন্দত্ব বোঝাতে সংস্কৃতে দুঃ ব'লে একটা উপসর্গ আছে, কু'ও যোগ করা যায়। কিন্তু বাংলায় এই প্রত্যয়গুলোতে যে কুৎসাবিশিষ্ট অবমাননা আছে অন্য কোনো ভাষায় বোধ হয় তা পাওয়া যায় না।

এবার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের আলোচনা ক'রে প্রত্যয়ের পালা শেষ করা যাক।

খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের স্ত্রী 'ব্যাঘ্রী', বাংলায় সে 'বাঘিনী'। সংস্কৃতে 'সিংহী'ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে 'সিংহিনী'। আকারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন 'লতা'; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারীশ্রেণীয় বলে

সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের 'সবিতা' নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় 'পিতা'কে পাছে কেউ এই নিয়মে মাতা ব'লে গণ্য করে। মেয়েদের নামে 'চন্দ্রমা' শব্দেরও ব্যবহার দেখেছি, আর মনে পড়ছে কোনো দুর্যোগে ভগবান চন্দ্রমা স্ত্রীছদ্মবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন। এ দিকে 'নীলিমা' 'তনিমা' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। 'নিভা' নামক একটা ছিন্নমুণ্ড শব্দ 'শরচ্চন্দ্রনিভাননা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।

স্ত্রীলিঙ্গের কোনো একটি বা একাধিক প্রত্যয় যদি নির্বিশেষে বা বাঁধা নিয়মে ভাষায় খাটত তা হলে একটা শৃঙ্খলা থাকত, কিন্তু সে সুযোগ ঘটে নি। বাংলায় 'উট' হয়তো 'উটী', কিন্তু 'মোষ' হয় না 'মোষী', এমন-কি 'মোষিনী'ও না—কী হয় বলতে পারি নে, বোধ করি 'মাদী মোষ'। 'হাতি' সম্বন্ধেও ঐ এক কথা, 'নাতনী' বলি কিন্তু 'হাতিনী' বলি নে। উট-হাতির চেয়ে কুকুর-বিড়াল পরিচিত জীব, 'কুকুরী' 'বিড়ালী' বললেই চলত, কিংবা 'কুকুরনী' 'বিড়ালনী'। বলা হয় না। মানুষ সম্বন্ধেও কেমন একটা ইতস্তত আছে — 'খোট্টানি' 'উড়েনি' ব'লে থাকি, কিন্তু 'পাঞ্জাবিনী' 'শিখিনী' 'মগিনী' বলি নে; 'মাদ্রাজিনী'ও তদ্রূপ; 'বাঙালিনী' বলি নে, 'কাঙালিনী' বলে থাকি।

আত্মীয়তা সম্বন্ধের নামগুলিতে স্ত্রী প্রত্যয়ের ছাপ আছে : দিদি মাসি পিসি শ্যালী শাশুড়ি ভাইঝি বোনঝি। 'ননদ' শব্দে ইনী যোগ না করলেও তার প্রভাব সম্পূর্ণ থেকে যায়। জা শ্যালাজ প্রভৃতি শব্দে দীর্ঘ ঈকারের সমাগম নেই।

জাতঘটিত ব্যাবসাঘটিত নামে নী ইনী যথেষ্ট চলে : বামনী কায়েতনী। অন্য জাত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 'বদ্দিনী' কখনো শুনি নি। 'বাগদিনী' চলে, 'ডোমনী' 'হাড়িনী'ও শুনেছি,

'সাঁওতালনী' বললে খটকা লাগে না। পুরুতনী ধোবানী নাপতিনী কামারনী কুমোরনী তাঁতিনী : সর্বদাই ব্যবহার হয়। অথচ শেলাই ব্যাবসা ধরলেও মেয়েরা 'দর্জিনী' উপাধি পাবে কি না সন্দেহ। যা হোক মোটের উপর বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে নী ইনী প্রত্যয়টারই চল বেশি।

একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। য়ুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক খেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উড্ডীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা শুশ্রূষার কাজে দারুণা মাথাধরায় বরফশীতলা জলপটির প্রয়োগ-সম্ভাবনা নেই।

এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যাভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী

কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।

১৪

বাংলা বিশেষ্যপদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই। অধিকাংশ স্থলেই 'সব' 'গুলি' 'সকল' প্রভৃতি শব্দ জোড়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। এ ভাষায় সর্বনাম শব্দে বহুবচনের বিভক্তি যতটা চলে অন্যত্র ততটা নয়। বহুবচনে 'মানুষরা' ব'লে থাকি অথচ 'ঘোড়ারা' বলতে কানে ঠেকে অথচ 'ঘোড়াদের' বলা চলে। মোটের উপর এ কথা খাটে যে সচেতন জীবদের নিয়ে বহুবচনে রা এবং সম্বন্ধে ও কর্মকারকে দের চিহ্ন ব্যবহার হয়ে থাকে। 'মোষেরা খুব বলবান জীব' বা 'ময়ূরদের পুচ্ছ লম্বা' এটা নিয়মবিরুদ্ধ নয়। এই রা চিহ্ন সাধারণ বিশেষ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ্যে ওর প্রয়োগ কানে বাধে। বলতে পারি 'ঐ মোষরা পাঁকে ডুবে আছে', কিন্তু 'ঐ মোষগুলো পাঁকে ডুবে আছে' বললেই মানানসই হয়। 'মোষরা' বললে মোষজাতিকে মনে আসে, 'মোষগুলো' বললে মনে আসে বিশেষ মোষের দল।

'মানুষরা নিষ্ঠুরতায় পশুকে হার মানালো' ঠিক শোনায়, এও ঠিক শোনায় : কুলিগুলো নির্দয়ভাবে গাড়িতে বোঝা চাপিয়েছে। কিন্তু 'মানুষগুলো পশুকে হার মানায়' অশুদ্ধ। সাধারণ বিশেষ্যে রা চলে কিন্তু বিশেষ বিশেষ্যে গুলো। 'মানুষরা ওখানে জটলা করছে' বললে মনে হয় যেন জানানো হচ্ছে অন্য কোনো জীব করে নি। এখানে 'মানুষগুলো' বললেই সংশয় থাকে না।

'টেবিলরা' 'চৌকিরা' নিষিদ্ধ। জড়পদার্থের 'গুলো' ছাড়া গতি নেই। আর-একটা শব্দ আছে, কথার পূর্বে বসে সমষ্টি বোঝায়, যেমন 'সব' : সব চৌকি, সব জন্তু, সব মানুষ। কিন্তু এখানে এই শব্দ কেবলমাত্র বহুবচন বোঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে একটা

ঝোঁক দেয়। সব চৌকি সরিয়ে দাও, অর্থাৎ একটাও বাকি রেখো না। সব ভিখিরিই বাঙালি, অর্থাৎ নির্বিশেষে বাঙালি। 'সব' প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 'গুলো' প্রয়োগটাও যোগ দিতে চায়, যেমন : সব চৌকি-গুলোই ভাঙা, সব ভিখিরিগুলোই চেঁচাচ্ছে। এখানে 'সব' বোঝাচ্ছে একান্ততা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন। বহুবচনে এক সময়ে 'সব' ব্যবহৃত হত। কবিতায় এখনো দেখা যায়, যেমন : পাখিসব তোমাসব ইত্যাদি। আমরা বলি : কাফ্রিরা সব কালো। বহুবচনের রা বিভক্তির সঙ্গে জোড়া লাগে 'সব' শব্দ : এরা সব গেল কোথায়। শুধু 'এরা গেল কোথায়' বললেই চলে, কিন্তু 'সব' শব্দের দ্বারা সমষ্টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই 'সব' শব্দ একবচনকে বহুবচন করে না, বহুবচনকে সুনির্দিষ্ট করে। 'সবাই' শব্দে আরও বেশি জোর লাগে : এরা যে সবাই চলে গেছে, কিংবা চৌধুরীদের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'সব' শব্দের সমার্থক হচ্ছে 'সকল' : এরা সকলেই চ'লে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু 'সকল' শব্দের প্রয়োগ 'সব' শব্দের চেয়ে সংকীর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ভাষার একটা বিশেষ ভঙ্গীর কথা বলি। 'সব' শব্দের অর্থে কোনো দূষণীয়তা নেই, 'যত' সর্বনাম শব্দটাও নিরীহ। কিন্তু দুটোকে এক করলে সেই জুড়িশব্দটা হয়ে ওঠে নিন্দার বাহন। 'মূর্খ' 'কুঁড়ে' কিংবা 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রভৃতি কটুস্বাদ বিশেষণ ঐ 'যত সব' শব্দটাকে বাহন ক'রে ভাষায় যেন মুখ সিট্‌কোতে আসে, যথা : যত সব বাঁদর, কিংবা কুঁড়ে, কিংবা লক্ষ্মীছাড়া। এখানে বলা উচিত ঐ 'যত' শব্দটার মধ্যেই আছে বিষ। 'যত বাঁদর এক জায়গায় জুটেছে' বললেই যথেষ্ট অকথ্য বলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়টা এই যে, 'যত' শব্দটা একটা অসম্পূর্ণ সর্বনাম, 'তত' দিয়ে তবে এর সম্পূর্ণতা। 'তত' বাদ দিলে 'যত' হয়ে পড়ে বেকার, লেগে যায় অনর্থক গালমন্দর কাজে।

বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা শ্রেণীর সর্বনাম, যথা

ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রশ্নবাচক।

'মুই' এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ 'আমি' রূপ ধরে ওকে করলে কোণঠেসা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সেকালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতাপ্রকাশের কাজে, যেমন : মুঞি অতি অভাগিনী।

নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যমপুরুষের বেলায় যথাস্থানে কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটে নি, নীচের বেঞ্চিতে ও রয়ে গেল। 'তুহিঁ' 'তুমি'-রূপে ভর্তি হয়েছে উপরের কোঠায়। এরও গৌরবার্থ অনেকখানি ক্ষয়ে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্যের আতিশয্যে। তাই উপরওয়ালাদের জন্যে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, 'আপহিঁ' থেকে 'আপনি'। আইনমতে মধ্যমপুরুষের আসন ওর নয়, ওর অনুবর্তী ক্রিয়াপদের রূপ দেখলেই তার প্রমাণ হয়। 'তুমি'র বেলায় 'আছ'; 'আপনি'র বেলায় 'আছেন', এই শব্দটি যদি খাঁটি মধ্যমপুরুষ-জাতীয় হত তা হলে ওর অনুচর ক্রিয়াপদ হতে পারত 'আপনি আছ' কিংবা 'আছঁ'।

'আপনি' শব্দের মূল হচ্ছে সংস্কৃত 'আত্মন্'। বাংলায় প্রথম-পুরুষেও 'স্বয়ং' অর্থে এর ব্যবহার আছে, যেমন : সে আপনিই আপনার প্রভু। আত্মীয়কে বলা হয় 'আপন লোক'। হিন্দিতে সম্মান-সূচক অর্থে প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ উভয়তই 'আপ' ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় উত্তমপুরুষে 'আম'-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তার তিনরকম রূপ প্রচলিত : করলাম, করলুম, করলেম। 'করলাম' নদিয়া হতে শুরু করে বাংলার পূর্বে ও উত্তরে চলে থাকে। এর প্রাচীন রূপ দেখেছি : আইলাঙ কইলাঙ। আমরা দক্ষিণী বাঙালি, আমাদের অভ্যস্ত 'করলুম' ও

'করলেম'। উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে সানুনাসিক উকার পদ্যে এখনো চলে, যেমন : হেরিনু করিনু। কলকাতার অপভাষায় 'করনু' 'খেনু' ব্যবহার শোনা যায়। ক্রিয়াপদে এই সানুনাসিক উ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট পাই : কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে, দুকুলে দিলুঁ দুখ, মলুঁ মলুঁ সই। 'করলেম' শব্দের আলোচনা পরে করা যাবে। কৃত্তিবাসের পুরাতন রামায়ণে দেখেছি 'রাখিলোম প্রাণ'। তেমনি পাওয়া যায় 'তুমি'র জায়গায় 'তোমি'। বাংলা ভাষায় উকারে ওকারে দেনাপাওনা চলে এ তার প্রমাণ।

প্রথমপুরুষের মহলে আছে 'সে' আর 'তিনি'। রামমোহন রায়ের সময়ে দেখা যায় 'তিনি' শব্দের সাধুভাষার প্রয়োগ 'তেঁহ'। মেয়েদের মুখে 'তেনার' তেনরা' আজও শোনা যায়, ওটা 'তেঁহ' শব্দের কাছাকাছি। প্রাচীন রামায়ণে 'তাঁর'। 'তাঁহার' শব্দ নেই বললেই হয়, তার বদলে আছে 'তান' 'তাহান'। ন'কারের অনুনাসিকটা বহু-বচনের রূপ। তাই সম্মানের চন্দ্রবিন্দুতিলকধারী বহুবচনরূপী 'তেঁহ' ও তিঁহো' (পুরাতন সাহিত্যে) হয়েছে 'তিনি'। গৌরবে তার রূপ বহুবচনের বটে, কিন্তু ব্যবহার একবচনের। তাই পুনর্বার বহুবচনের আবশ্যকে রা বিভক্তি জুড়ে 'তাঁহা' শব্দের রাস্তা দিয়ে 'তাঁহারা' শব্দ সাজানো হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে যে ক্রিয়াপদটি তার দখলে তাতে আছে প্রাচীন ন'কারান্ত বহুবচনরূপ, যেমন 'আছেন'। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তী বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদে বহুবচনের চিহ্ন থাকলেও তার অর্থ হয়েছে লোপ। সংস্কৃতে বহুবচনে 'পতন্তি' শব্দ আছে প্রথমপুরুষের পতন বোঝাতে। বাংলায় সেই অন্তি'র ন রয়েছে 'পড়েন' শব্দে, কিন্তু এ ভাষায় 'তিনি'ও পড়েন 'তাঁরা'ও পড়েন। এই ন'কারধারী ক্রিয়াপদ কেবল 'আপনি' আর 'আপনারা', 'তিনি' ও 'তাঁরা', এঁদের সম্মান রক্ষার কাজেই নিযুক্ত। প্রাচীন রামায়ণে এইরূপ স্থানে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় 'পড়েন্ত' 'দেখিলেন্ত' প্রভৃতি ন্ত-বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ একবচনে এবং বহুবচনে, প্রথমপুরুষে।

সদ্যঅতীত কালের প্রথমপুরুষ ক্রিয়াপদে বিকল্পে ইল এবং ইলে প্রয়োগ হয়, যেমন : সে ফল পাড়ল, সে ফল পাড়লে। এই একার প্রয়োগ প্রাচীন পদাবলীতে দৈবাৎ দেখেছি, যথা : বিঁধিলে বাণ। কিন্তু অনেক দেখা গেছে ময়নামতীর গানে, যেমন : বিকল দেখি হাড়িপা রহিলে। এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, অচেতনবাচক শব্দের ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না। অসমাপিকাতে লাগে, যেমন : পা ফুললে ডাক্তার ডেকো। 'তার পা ফুলল' হয়, 'পা ফুললে' হয় না। নির্বস্তুক শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা : তাঁর কলকাতায় যাওয়া ঘটল না। 'ঘটলে না' হতে পারে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্রিয়াপদে 'এ' খাটে না : এল গেল হল, প'ল (পড়ল), ম'ল (মরল)। দুই অক্ষরের ক্রিয়াপদমাত্রে এই ব্যতিক্রম হয় এমন যেন মনে করা না হয়। তার প্রমাণ : খেল নিল দিল শুল ধুল। ইতে-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না, যেমন : করতে থাকল, হাসতে লাগল। কিন্তু ইয়া-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে লাগে, যেমন : সে হেসে ফেললে। এ ছাড়া আরও দুই-এক জায়গায় কানে সন্দেহ ঠেকে, যেমন 'ভোর বেলায় সে মরলে' বলি নে, 'মরল'ই ঠিক শোনায়। কিন্তু 'তিনি মরলেন' নিত্যব্যবহৃত। 'কলকাতায় সে চললে' বলি নে, কিন্তু 'তিনি চললেন' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রাচীন রামায়ণে দেখা গেছে প্রথমপুরুষের সদ্যঅতীত ক্রিয়াপদে প্রায় সর্বত্রই ক-প্রত্যয়-সমেত একার, যেমন : দিলেক লইলেক। আবার একারের সম্পর্ক নেই এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে, যেমন : চলিল সত্বর, পাঠাইল ত্বরিত। আধুনিক বাংলায় এইরূপ ক্রিয়াপদে কোথাও 'এ' লাগে কোথাও লাগে না, কিন্তু অন্তস্থিত ক-প্রত্যয়টা খসে গেছে।

প্রথমপুরুষ ইল-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদে এই-যে একার প্রয়োগ, এরই সঙ্গে সম্ভবত 'করলেম' 'চললেম' শব্দের একার-উচ্চারণের যোগ আছে। করলেন (করিল তিনি), আর, করলেম (করিল আমি) : এক নিয়মে পাশাপাশি বসতে পারে। আরও একটা কারণ উল্লেখ করা যেতে

পারে, সে হচ্ছে স্বরবিকারের নিয়ম। ই'র পর আ থাকলে দুইয়ে মিলে 'এ' হয় তার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন 'ঈশান' থেকে 'ঈশেন', 'বিলাত' থেকে 'বিলেত', 'নিশান' থেকে 'নিশেন'।

এক কালে 'মুই' ভদ্র সমাজে ত্যাজ্য ছিল না। প্রাচীন রামায়ণে পাওয়া যায় 'মুঞি নরপতি'। কর্মকারকে 'মোকে', কোথাও বা 'মোখে'। বহুবচনে 'মোরা'। আজ 'মোরা' রয়ে গেছে কাব্যলোকে। কবির কলমে 'আমরা' শব্দের চেয়ে 'মোরা' শব্দের চলন বেশি। প্রাচীন বাংলায় 'আমরা' 'তোমরা'র পরিবর্তে 'আমিসব' 'তুমিসব' শব্দের ব্যবহার প্রায়ই দেখা গেছে।

আমি তুমি আপনি তিনি : ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, মানুষ সম্বন্ধেই খাটে। 'সে' কেবলমাত্র মানুষ নয় জন্তু সম্বন্ধেও খাটে, যেমন : কুকুরটাকে মারতেই সে চেঁচিয়ে উঠল। 'সে' থেকে বিশেষণ শব্দ হয়েছে 'সেই'। এর প্রয়োগ সর্বত্রই : সেই মানুষ, সেই গাছ, সেই গোরু। 'এ' থেকে হয়েছে 'এই'। 'এ' বোঝায় কাছের বর্তমান পদার্থকে, 'সে' বোঝায় অবর্তমানকে। সম্মানার্থে 'এ' থেকে হয়েছে 'ইনি'।

বাংলা ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। ইংরেজিতে প্রথম পুরুষে he পুংলিঙ্গ, she স্ত্রীলিঙ্গ, it ক্লীবলিঙ্গ। ইংরেজিতে যদি বলতে হয়, সে প'ড়ে গেছে, তবে সেই প্রসঙ্গে he, she বা it বলাই চাই। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গের নির্দেশ আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের নেই। সে এ ও তিনি ইনি উনি : স্ত্রীও হয়, পুরুষও হয়। ক্লীবলিঙ্গে 'সে' 'এ' 'ও' শব্দে নির্দেশক চিহ্ন যোগ করা চাই, যেমন : সেটা ওটা সেখানা ওখানা। বাংলা কাব্যে এই প্রথমপুরুষ সর্বনামে যখন ইচ্ছাপূর্বক লিঙ্গ নির্দেশ করা হয় না তখন তার ইংরেজি তর্জমা অসম্ভব হয়। 'যে' সর্বনাম পদের সঙ্গে কোনো না কোনো বিশেষ্য উহ্য বা ব্যক্ত রূপে থাকেই। 'যে গান গাচ্ছে' বলতে বোঝায়, যে মানুষ। অন্যত্র : যে ঘড়ি চলছে না, যে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

'যেই' শব্দের একটি প্রয়োগ আছে, তাতে 'মুহূর্তে' বা 'ক্ষণে' উহ্য থাকে, যথা : যেই এল অমনি চলে গেল, যেই দেখা সেই আর মুখে কথা নেই। এখানে 'যেই আর সেই' শব্দের পিছনে উহ্য আছে 'ক্ষণে'। অন্যত্র 'যেই' বা 'সেই' শব্দের প্রয়োগে উহ্য থাকে 'মানুষ', যেমন : যেই আসুক সেই মার খাবে। 'যাই' শব্দের সঙ্গে উহ্য থাকে দুটি বিশেষণের দ্বন্দ্ব, যেমন : সে যাই বলুক। অর্থাৎ, এটাই বলুক বা ওটাই বলুক, ভালোই বলুক বা মন্দই বলুক। আর-এক প্রকার প্রয়োগ আছে 'যেই কথা সেই কাজ', অর্থাৎ কাজে কথায় প্রভেদ নেই— এখানে ই প্রত্যয় নিশ্চয়তা অর্থে ঝোঁক দেবার জন্যে।

'যে' অসম্পূর্ণার্থক সর্বনাম বিশেষণ, মানবার্থে তার পূরণ হয় 'ও' এবং 'সে' দিয়ে। অন্য জীব বা বস্তুর সম্বন্ধে যখন তার প্রয়োগ হয় তখন সেই বস্তু বা জীবের নাম তার সঙ্গে জুড়তে হয়, যেমন : যে পুকুর, যে ঘটি, যে বেড়াল। নির্বস্তুক শব্দেও সেই নিয়ম, যেমন : যে স্নেহ শিশুর অনিষ্ট করে সে স্নেহ নিষ্ঠুরতা।

কখনো কখনো বাক্যকে অসম্পূর্ণ রেখে 'যে' শব্দের ব্যবহার হয়, যেমন : যে তোমার বুদ্ধি। বাকিটুকু উহ্য আছে বলেই এর দংশনের জোর বেশি। বাংলা ভাষায় এইরকম খোঁচা-দেওয়া বাঁকা ভঙ্গীর আরও অনেক দৃষ্টান্ত পরে পাওয়া যাবে।

মানুষ ছাড়া আর কিছুকে কিংবা সমূহকে বোঝাতে গেলে 'যে' ছেড়ে 'যা' ধরতে হবে, যেমন : যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে। কিন্তু 'যারা' শব্দ 'যা' শব্দের বহুবচন নয়, 'যে' শব্দেরই বহুবচন, তাই ওর প্রয়োগ মানবার্থে। 'তা' বোঝায় অচেতনকে, কিন্তু 'তারা' বোঝায় মানুষকে। 'সে' শব্দের বহুবচন 'তারা'।

শব্দকে দুনো করে দেবার যে ব্যবহার বাংলায় আছে, 'কে' এবং 'যে' সর্বনাম শব্দে তার দৃষ্টান্ত দেখানো যাক : কে কে এল, যে যে এসেছে। এর পূরণার্থে 'সে সে লোক' না বলে বলা হয় 'তারা' কিংবা 'সেই সেই লোক'। 'যেই যেই লোক'এর ব্যবহার নেই। সম্বন্ধপদে

'যার যার' 'তার তার' মানবার্থে চলে। এইরকম দ্বৈতে বহুকে এক এক ক'রে দেখবার ভাব আছে। ভিন্ন ভিন্ন তুমি'কে নির্দেশ ক'রে 'তুমি তুমি' 'তোমার তোমার' বললে দোষ ছিল না, কিন্তু বলা হয় না।

যে বাক্যের প্রথম অংশে দ্বৈতে আছে 'যে' তার পূরণার্থক শেষ অংশে সমগ্রবাচক বহুবচন ব্যবহারটাই নিয়ম, যেমন : যে যে লোক, বা যাঁরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের পান দিয়ো।

যত এত তত অত কত শব্দ পরিমাণবাচক। এদের মধ্যে 'তত' শব্দ ছাড়া আর সবগুলিতে দ্বিত্ব চলে।

এখন তখন যখন কখন কালবাচক। 'কখন' শব্দ প্রায়ই প্রশ্ন-সূচক, সাধারণভাবে 'কখন' বলতে অনিশ্চিত বা দূরবর্তী সময় বোঝায় : কখন যে গেছে। কিন্তু 'কখনো' প্রশ্নার্থক হয় না। প্রশ্নের ভাবে যখন বলি 'সে কখনো এ কাজ করে' তখন 'কি' অব্যয় শব্দ উহ্য থাকে। দ্বিত্বে 'কখনো' শব্দের অর্থ 'মাঝে মাঝে'। 'কখনোই' একটা 'না' চায় : কখনোই হবে না।

'কখন' শব্দের 'কী খেনে'-ভঙ্গীওয়ালা রূপ কাব্যসাহিত্যে পাওয়া যায়।

'কভু' শব্দের অর্থও 'কখনো'। এখন দৈবাৎ পদ্যে ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগে না। ওর জুড়ি ছিল 'তবু' শব্দটা, কিন্তু ওর সময়বাচক অর্থটা নেই। 'তবু' শব্দের দ্বারা এমন কোনো সম্ভাবনা বোঝায় যেটা ঠিক উপযুক্ত বা আকাঙ্ক্ষিত নয় : যদিও রৌদ্র প্রখর তবু সে ছাতা মাথায় দেয় না, আমি তো বারণ করেছি তবু যদি যায় দুঃখ পাবে। কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণে বহুবচন বা কর্মকারক নেই। সম্বন্ধপদে : এখনকার তখনকার কখনকার, কোন্ সময়কার, কোন্ সময়টার। অধিকরণে : কোন্ সময়ে, যে সময়ে। পদ্যে 'কোন্ খনে', গ্রাম্য ভাষায় 'কী খেনে' এবং অধিকাংশ স্থলেই শুভ অশুভ লক্ষণ-সূচনায় এর প্রয়োগ হয়। অপাদান : যখন থেকে, কোন্ সময় থেকে।

কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ আরও একটা বাকি আছে 'কবে'। ওর

দুটি জুড়ি ছিল : এবে যবে। তারা পদ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ‘তবে’ একদা ওদেরই দলে ছিল, কিন্তু এখন ‘তবু’ শব্দের মতো সেও অর্থ বদলিয়েছে। একটা সম্ভাবনার সঙ্গে আর-একটা সম্ভাবনাকে সে জোড়ে, যেমন : যদি যাও তবে বিপদে পড়বে। তবে এক কাজ করো : ‘তবে’ শব্দের পূর্ববর্তী উহ্য ব্যাপারের প্রসঙ্গে কোনো কাজ করার পরামর্শ।

এই প্রসঙ্গে ‘সবে’ শব্দটার উল্লেখ করা যেতে পারে। বলে থাকি : সবে এইমাত্র চলে গেছে, সবে পাঁচটা বেজেছে। এখানে ‘সবে’ অব্যয়, ওতে মাত্রা বোঝায়, সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণের সীমা বোঝাতে তার প্রয়োগ : সবে পাঁচজন। সবে ভোর হয়েছে : অর্থাৎ সময়ের মাত্রা ভোরে এসে পৌঁচেছে। সেইরকম : সবে এক পোওয়া দুধ।

যেমন তেমন অমন এমন কেমন তুলনাবাচক। ‘কেমনে’ শব্দের ব্যবহার পদ্যে করণকারকে। ‘কেমন’ শব্দের দ্বৈতে সন্দেহ বোঝায় : কেমন কেমন ঠেকছে। গা কেমন কেমন করছে : একটা অনির্দিষ্ট অসুস্থ ভাব। ‘কেমন’ শব্দের সঙ্গে ‘যেন’-যোগে সংশয় ঘনীভূত হয়, আর সে সংশয়টা অপ্রিয়। লোকটাকে কেমন যেন ঠেকছে : অর্থাৎ ভালো ঠেকছে না। ভঙ্গীওয়ালা ‘কেমন’ শব্দটা আছে খোঁচা দেবার কাজে : কেমন জব্দ, কেমন মার মেরেছে, কেমন জুতো, কেমন ঠকানটাই ঠকিয়েছে।

অধিকরণের বাহনরূপে ‘এমনি’ শব্দের ব্যবহার আছে : এমনিতেই জায়গা পাই নে। খোঁচা দেবার ভঙ্গীতেও এই শব্দটার যোগ্যতা আছে : এমনিই কী যোগ্যতা।

‘যত’ শব্দ তার জুড়ি হারালে টিটকারির কাজে লাগে সে কথা পূর্বেই বলেছি। ‘অত’ কথাটারও তীক্ষ্ণতা আছে, যেমন : অত চালাকি কেন, অত বাবুগিরি তোমাকে মানায় না, অত ভালোমানুষি করতে হবে না।

এ জাতীয় আরও দৃষ্টান্ত আছে, যথা ‘যে’ এবং ‘যেমন’। ‘সে’ এবং ‘তেমন’এর সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ ঘটানো যায়. তবে মুখ বাঁকানোর

ভঙ্গী আনে, যথা : যে মধুর বাক্য তোমার। 'তেমন'এর সঙ্গবর্জিত 'যেমন' শব্দটাও বদমেজাজি : যেমন তোমার বুদ্ধি।

এই ধরনেরই আর-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে : কোথাকার মানুষ হে। এ বাক্যটার চেহারা প্রশ্নেরই মতো, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা রাখে না। এতে যে সংবাদ উহ্য আছে সে নিবাসঘটিত নয়, সে হচ্ছে লোকটার ধৃষ্টতার বা মূর্খতার পরিচয় নিয়ে। কোথাকার সাধু-পুরুষ এসে জুটল : লোকটার সাধুতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ হচ্ছে না।

'যেমতি' 'তেমতি' পদ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'সেইমতো' 'এইমতো' এখনো টিঁকে আছে। কিন্তু 'এর মতো' 'তার মতো'র ব্যবহারটাই বেশি। করণকারকে রয়ে গেছে 'কোনোমতে'। অথচ 'কোনোমতো' বা 'কোন্‌মতো' শব্দটা নেই।

'কেন' শব্দটা সর্বনাম। এর অর্থ প্রশ্নবাচক, এর রূপটা করণ-কারকের। ঘটনা ঘটল কেন : অর্থাৎ ঘটল কী কারণের দ্বারা। 'কেনে বা' প্রাচীন কাব্যেও পড়েছি, গ্রাম্য লোকের মুখেও শোনা যায়।

কেন, কেন বা, কেনই বা। 'লোকটা কেন কাঁদছে' এ একটা সাধারণ প্রশ্ন। 'কেন বা কাঁদছে' বললে কান্নাটা যে ব্যর্থ বা অবোধ্য সেইটে বলা হল। কেন বা এলে বিদেশে : অর্থাৎ বিদেশে আসাটা নিষ্ফল। কেনই বা মরতে এখানে এলুম : এ হল পরিতাপের ধিক্কার। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই প্রয়োগগুলির সবগুলোই অপ্রিয়তাব্যঞ্জক। কেন তিনি তিব্বতি পড়ছেন তা নিজেই জানেন না : এ সহজ কথা। যেই বলা হল 'কেনই বা তিনি তিব্বতি পড়তে বসলেন' অমনি বোঝা যায়, কাজটা সুবুদ্ধির মতো হয় নি।

'কেন' শব্দের এক বর্গের শব্দ 'যেন' 'হেন'। 'যেন' সাদৃশ্য বোঝাতে। 'হেন' শব্দের প্রয়োগ বিশেষণে, যথা : হেন রূপ দেখি নাই কভু, হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, সে-হেন লোকও তেড়ে এল। হেন কাজ=এমন কাজ। সে হেন=তার মতো।

'যেন' শব্দটাতে বিদ্রূপের ভঙ্গী লাগানো চলে : যেন নবাব খাঞ্জে

খাঁ, যেন আহ্লাদে পুতুল, যেন কার্তিকটি, যেন ডানাকাটা পরী। বাংলায় বিদ্রূপের ভঙ্গীরীতি অত্যন্ত সুলভ।

'তেন' শব্দের ব্যবহার লোপ পেয়েছে। 'হেন' শব্দের অর্থ 'মতো' কিংবা 'এইমতো'। এর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় 'তেন' শব্দের অর্থ 'সেইমতো'। 'হেন-তেন' জোড়া শব্দ এখনো চলিত আছে। হেন-তেন কত কী ব'কে গেল : অর্থাৎ, ব'কল কখনো এরকম কখনো সেরকম, অসংলগ্ন বকুনি। প্রাচীন বাংলায় দেখেছি 'যেন কন্যা তেন বর'। এখানে 'যেন' শব্দের 'যে-হেন' অর্থ।

'যেন' শব্দটা 'হেন' শব্দের জুড়ি। পদাবলীতে পাওয়া গেছে, 'যেহ্ন' (যে-হেন)। বোঝা যায় এই 'হেন' শব্দের যোগেই 'যেন' শব্দ চেহারা পেয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'যেন' শব্দটা তুলনা-উপমার কাজেই লাগে, কিন্তু পুরাতন বাংলায় তার অর্থের বিকৃতি হয় নি। তখন তার অর্থ ছিল 'যেমন' : যেন যায় তেন আইসে, যেন রাজা তেন দেশ।

'হেন' শব্দটা রয়ে গেছে ভাষার মহদাশ্রয় পদ্যে। কিন্তু 'সে' কিংবা 'এ' শব্দের যোগে এখনো চলে, যেমন : সে-হেন লোক। এই 'হেন' শব্দের যোগে ঐ 'সে' শব্দে অক্ষমতা বা অসম্মানের আভাস দেয়। যেমন : সে-হেন লোক দৌড় মারলে। 'হেন' শব্দের যোগে 'এ' শব্দে অসামান্যতা বোঝায়, যেমন : এ-হেন লোক দেখা যায় না, এ-হেন দুর্দশাতেও মানুষ পড়ে।

'কেন'র সঙ্গে 'যে' যোগ করলে পরিতাপ বা ভর্ৎসনার ভঙ্গী আসে, যেমন : কেন যে মরতে আসা, কেন যে এতগুলো পাস করলে। 'কী করতে' শব্দটারও ঐরকম ঝোঁক, অর্থাৎ তাতে আছে ব্যর্থতার ক্ষোভ।

শুধু 'কী' শব্দেব মধ্যেও এই রকমের ভঙ্গী। এই কাজে ওর সঙ্গে যোগ দেয় 'ই' অব্যয় : কী চেহারাই করেছ; কী কবিতাই লিখেছেন, কী সাধুগিরিই শিখেছ। ঐ 'কী'এর সঙ্গে 'বা' যোগ

করলে ঝাঁজ আরও বাড়ে। 'কী বা'কে বাঁকিয়ে 'কী বে' করলে ভঙ্গীতে আরও বিদ্রূপ পৌঁছয়। 'ই'র সহযোগিতা বাদ দিলে 'কী' বিশুদ্ধ বিস্ময় প্রকাশের কাজে লাগে : কী সুন্দর তার মুখ।

সম্মান খর্ব করবার বিশেষ প্রত্যয় বাংলাভাষায় যথেষ্ট পাওয়া গেল, সর্বনামের প্রয়োগেও বক্রোক্তি দেখা গেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা বা প্রশংসা -প্রকাশের প্রয়োজনে ভাষায় কেবল একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে 'আহা' অব্যয় শব্দটার যোগে, যেমন : আহা মানুষটি বড়ো ভালো। করুণা প্রকাশেও এর ব্যবহার আছে। অথচ 'আহামরি' শব্দের পরিণামটা ভালো হয় নি। গোড়ায় এর উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, এখন এ শব্দটার যে প্রকৃত স্বভাব সেইটাই গেছে বিপরীত হয়ে। এটা হয়েছে বিদ্রূপের বাহন। ওটাকে আরও একটু প্রশস্ত ক'রে হল 'আহা ম'রে যাই'; এর ঝাঁজ আরও বেশি। পদে পদে বাংলায় এই বাঁকা ভঙ্গীটা এসে পড়ে : ভা-রি তো পণ্ডিত, ম-স্ত নবাব। এদের কণ্ঠস্বর উৎসাহে দীর্ঘকৃত হয়ে গাল পাড়ে যথার্থ মানেটাকে ডিঙিয়ে। 'হাঁদারাম' 'ভোঁদারাম' বোকারাম' 'ভ্যাবাগঙ্গা-রাম' শব্দগুলোর ব্যবহার চূড়ান্ত মূঢ়তা প্রকাশের জন্যে। কিন্তু 'সুবুদ্ধিরাম' 'সুপটুরাম' বলবার প্রয়োজনমাত্র ভাষা অনুভব করে না। সবচেয়ে অদ্ভুত এই যে 'রাম' শব্দের সঙ্গেই যত বোকা বিশেষণের যোগ, 'বোকা লক্ষ্মণ' বলতে কারও রুচিই হয় না।

'কি' যেখানে অব্যয় সেখানে প্রশ্নের সংকেত। ঊহ্য বিশেষ্যের সহযোগে বিশেষণে ওর প্রয়োগ আছে। তুমি কী করছ : অর্থাৎ 'কী কাজ' করছ। আর-একটা প্রয়োগ বিস্ময় বোঝাতে, যেমন : কী সুন্দর। পূর্বেই বলেছি তীক্ষ্ণধার স্বরবর্ণ 'ই' সঙ্গে না থাকলে এর সৌজন্য বজায় থাকে। বিশেষণ-প্রয়োগে 'কী', যথা : কী কাজে লাগবে জানি নে। 'কী' বিশেষণ শব্দে অচেতন বা নির্বস্তুক বা অনির্দিষ্ট বোঝায় : ওর কী দশা হবে, কী হতে কী হল। বিকল্প বোঝাতে ওর প্রয়োগ আছে, যেমন : কী রাম কী শ্যাম কাউকেই

বাদ দেওয়া যায় না। ‘কোন্’ বিশেষণ জড় চেতন দুইয়েই লাগে।

সর্বনামের কর্মকারকে সাধারণত ‘কে’ বিভক্তি : আমাকে তোমাকে। ‘সে’র বেলায় ‘তাকে’ কিংবা ‘সেটিকে’ ‘সেটাকে’।

বাংলা সর্বনাম করণকারকে একটা বিভক্তির উপরে আর-একটি চিহ্ন জোড়া হয়। বিভক্তিটা সম্বন্ধপদের, যেমন ‘আমার’, ওতে জোড়া হয় ‘দ্বারা’ শব্দ : আমার দ্বারা। আর-একটা শব্দচিহ্ন আছে ‘দিয়ে’। তার বেলায় মূলশব্দে লাগে কর্মকারকের বিভক্তি : আমাকে দিয়ে।

‘কী’ শব্দের করণকারকের রূপ : কিসে, কিসে ক’রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা। অধিকরণেরও রূপ ‘কিসে’, যথা : এ লেখাটা কিসে আছে। এ-সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত, এরা বহুবচনে হবে : এগুলোকে দিয়ে, সেগুলোকে দিয়ে, কোন্‌গুলোকে দিয়ে। অসম্মানে মানুষের বেলা হয়; নচেৎ হয় : এদের দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওদের দিয়ে।

সাধারণত বাংলায় বিশেষণপদের বহুবচনরূপ নেই। ওদের অধিকৃত বিশেষ্য শব্দগুলিতে বহুবচনের ব্যবস্থা করতে হয়, যথা : বুনো পশুদের, পিতলের ঘটিগুলোর। বলা বাহুল্য ‘ঘটিদের’ হয় না, ‘পশুদের’ হয়। ‘রা’ এবং ‘দের’ বিভক্তি জড়বাচক শব্দের অধিকারে নেই। তার পক্ষে ‘গুলো’ শব্দই বৈধ। অথচ ‘গুলো’ অপর পক্ষের ব্যবহারেও লাগে। কিন্তু পরিমাণবাচক ‘এত’ ‘তত’ ‘যত’ ‘কত’ বিশেষণের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তি ‘গুলো’ যুক্ত হয়। তা ছাড়া ‘এ’ ‘সে’ ‘যে’ ‘ও’ ‘ঐ’ ‘সেই’ ‘কোন্’ শব্দের সঙ্গে বহুবচনে কর্তৃপদে ‘গুলো’ ও কর্মকারকে বা সম্বন্ধে ‘দের’ যোগ করা হয়।

বাংলা সর্বনামশব্দ-প্রয়োগে একটা খটকার জায়গা আছে।

‘আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে’ এমন কথা শোনা যায়। কে কাকে খাওয়াবে তর্কটা পরিষ্কার হয় না। এমন স্থলে যিনি খাওয়াবার কর্তা তাঁকে সম্বন্ধ-আসনে বসালে কথাটা পাকা হয়।

আর সেটা যদি ক্রিয়াপদের পূর্বেই থাকে তা হলে দ্বিধা মেটে। 'আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে' বাক্যটা স্পষ্ট। গোল বাধে বহুবচনের বেলায়। কেননা বহুবচনে সম্বন্ধপদের 'দের' আর কর্ম-কারকের 'দের' একই চেহারার। এর একমাত্র উপায় 'কে' বিভক্তি দ্বারা কর্মকারককে নিঃসংশয় করা। 'আমাদেরকে তোমাদের খাওয়াতে হবে' বললে নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়। সম্বন্ধকারকের চিহ্নে কর্মকারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষার অমার্জনীয় ঢিলেমি।

১৫

বাংলায় নির্দেশকশব্দরূপে প্রধানত ব্যবহৃত হয় : টি টা খানি খানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the. ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলায় নির্দেশক শব্দ বসে. শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অনুষঙ্গে। যা বস্তু বা জীব -বাচক নয় স্থানবিশেষে তার সঙ্গেও যোগ হয়, যেমন : বেশি লজ্জাটা ভালো নয়. ওর হাসিটি বড়ো মিষ্টি। এখানে লজ্জা ও হাসিকে বস্তুর মতোই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

এক দুই তিন শব্দ সংখ্যাবাচক। ওদের সঙ্গে প্রায় নিত্যযোগ টি ও টা'র। ইংরেজিতে এ দস্তুর নেই। বাংলায় সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সমাসে বাঁধা পড়ে তখন তাদের 'টি' 'টা' পড়ে খ'সে, যেমন : দশসের আটহাত পাঁচমিশলি। তা ছাড়া 'জন' শব্দের সংযোগে 'টি' 'টা' চলে না। 'একটি জন' বলি নে, অথচ 'একটি মানুষ' বলেই থাকি।

আরও কয়েকটি নির্দেশক শব্দ আছে, যেমন : টু টুক্ টুকু গোছা গাছি। তেল জল ধুলো কাদা প্রভৃতি অনির্দিষ্ট-আকার-বাচক শব্দে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার চলে না। 'একটা তেল' 'একটি ধুলো' বলি নে, কিন্তু 'একটু তেল' 'একটু ধুলো' বলেই থাকি। 'অনেকটা

জল' 'অনেকটা ময়দা' বলে থাকি কিন্তু 'অনেকটি' মাটি বা দুধ বলা চলে না। কেননা 'টা' শব্দে ব্যাপকতা বোঝায়, 'টি' শব্দে বোঝায় খণ্ডতা।

টু টুক্ টুকু : স্বল্পতাসূচক। সজীব পদার্থে এর ব্যবহার নেই। ছোটো গাধার বাচ্ছাকেও কেউ 'গাধাটুকু' বলবে না, পরিহাস ক'রে 'মানুষটুকু' বলা চলে।

সরু লম্বা জিনিসের সঙ্গে 'গাছি' 'গাছা'র ব্যবহার : দড়িগাছা বেতগাছা হারগাছা। দুই-একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যেমন 'চুড়িগাছি।' লম্বায়-ছোটো জিনিসে চলে না; 'গোঁফগাছি' কিছুতেই নয়। 'টুকু' চলে ছোটো জিনিসে, কিন্তু গড়নওয়ালা জিনিসে নয়। 'চুনটুকু' হয়, 'পদ্মটুকু' হয় না; 'আংটিটুকু' হয় না, 'পশম-টুকু' হয়। সন্ন্যাসীঠাকুরের 'রাগটুকু' প্রভৃতি অবস্তুবাচক শব্দেও চলে। 'একটুকু' হয়, কিন্তু 'দুটুকু' 'তিনটুকু' হয় না। 'ঐটুক্' শব্দের সঙ্গে 'খানি' জোড়া যায়, 'খানা' যায় না; 'একটুকখানি', কিন্তু 'একটুকখানা' নয়। জীববাচক শব্দে খাটে না; 'একটুক জীব' নেই কোথাও।

আরও কয়েকটি নির্দেশক পদ আছে যা শব্দের পূর্বে বসে। তারা সর্বনাম জাতের, যেমন : সেই এই ঐ।

১৬

বাংলা বিশেষ্যশব্দে সংস্কৃত বিশেষ্যশব্দের অনুস্বার বিসর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকে চিহ্নের কোনো উৎপাত নেই। একেবারে নেই বলাও চলে না। কর্তৃপদে মাঝে মাঝে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন : পাগলে কী না বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এইরকম প্রয়োগকে তির্যকরূপ বলেন, এ যেন শব্দকে ত্যাড়চা করে দেওয়া। সব গৌড়ীয় ভাষায় এই তির্যকরূপ পাওয়া যায়, যেমন : 'দেবে' 'জনে' 'ঘোড়ে'। বাংলায় বলি : দেবে মানবে

লেগেছে, পাঁচজনে যা বলে। 'ঘোড়ে' বাংলায় নেই, আছে 'ঘোড়ায়' : ঘোড়ায় লাথি মেরেছে।

এই তির্যকরূপের ভিতর দিয়েই কারকের বিভক্তিগুলো তৈরি হয়েছে, আর হয়েছে বহুবচনের রূপ, যেমন : মানুষে থেকে, মানুষেরা, মানুষেতে, মানুষেদের। তোমা আমা যাহা তাহা থেকে : তোমার আমার যাহার তাহার তোমাকে আমাকে ইত্যাদি।

এই তির্যকরূপের কর্তৃকারক এক সময়ে সাধারণ অর্থে ছিল : আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দনে, সোই আপনে করু সেবা। প্রাচীন রামায়ণে দেখা যায় নামসংজ্ঞায় প্রায় সর্বত্রই এই তির্যকরূপ, যেমন : সুমিত্রায়ে কৌশল্যায়ে মন্থরায়ে লোমপাদে। এখন এর ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব ঘটেছে। 'বানরে কলা খায়' বলে থাকি, 'গোপালে সন্দেশ খায়' বলি নে। বাংলার কোনো কোনো অংশে তাও বলে শুনেছি। ময়মনসিংহগীতিকায় আছে : কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোয়ামিজনে।

শ্রেণীবাচক কর্তৃপদে তির্যকরূপ দেখা যায়, অন্যত্র যায় না। 'বাঘে গোরুটাকে খেয়েছে' বললে বোঝায় : বাঘজাতীয় জন্তুতে গোরুকে খেয়েছে, ভালুকে খায় নি। যখন বলি 'রামে মারলে মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন ব্যক্তিগত রামরাবণের কথা বলি নে; তখন রাম-শ্রেণীয় আঘাতকারী ও রাবণশ্রেণীয় আঘাতকারীর কথা বলা হয়।

'জন' শব্দের তির্যকরূপ 'জনা'। একো জনা একো রকমের : এই 'জনা' বিশেষ একজনের সম্বন্ধে নয়, জনগুলি এক-একটি শ্রেণীগত। 'একহ' শব্দ থেকে হয়েছে 'একো'।

মনে রাখা দরকার, কর্তৃপদের এই তির্যকরূপ জড় পদার্থে খাটে না। যখন বলি 'মেঘে অন্ধকার করেছে' তখন বুঝতে হবে, 'মেঘে' করণকারক।

গৌড়ীয় ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, শব্দরূপে সম্বন্ধ-পদের চিহ্নই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশেষে প্রয়োজনমতো তারই উপরে

স্বতন্ত্র কারকের বিভক্তি যোগ করতে হয়েছে। তারই নিদর্শন পাই কর্মকারকে 'তোমারে' 'শ্রীরামেরে' প্রভৃতি শব্দে। আধুনিক বাংলা পদ্যেও এই 'রে' বিভক্তিরই প্রাধান্য। বাংলা রামায়ণ-মহাভারতে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি অল্প। কবিকঙ্কণে দেখা গেছে : খাওয়াব তোমাকে হে নবাৎ আম্ররসে। অন্যত্র : উজানী নগরকে বাসিবে যেন হিম। এরকম প্রয়োগ বেশি নেই।

বাংলা নির্বস্তুক পদার্থ-বাচক শব্দের কর্মকারকে টা টি'র প্রয়োগ-বাহুল্য, যথা 'মৃত্যুভয় দূর করো', 'চক্ষুলজ্জা ছাড়ো'। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু বিশেষত্বের ঝোঁক দিয়ে বলা চলে : মৃত্যুভয়টা দূর করো, চক্ষুলজ্জাটা ছাড়ো। 'মৃত্যুভয়টাকে দূর করো' বলতেও দোষ নেই।

মানুষের বা জন্তু-জানোয়ারের বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন নিয়ে শৈথিল্য করা হয় নি : গোপাল যদি সন্দেশের যোগ্য হয় তা হলে গোপালকেই সন্দেশ দেওয়া যায়। কিন্তু যে বিশেষ্যপদ সাধারণবাচক তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না, যেমন : রাখাল গোরু চরায়। 'গোরুকে' চরায় না। ময়রা সন্দেশ বানায়, 'সন্দেশকে' বানায় না।

বিপদ এই, একটা নিয়মের নাগাল যেই পাওয়া যায় অমনি জুটে যায় অনিয়মের দৃষ্টান্ত, যথা : যে গাড়োয়ান গোরুকে পীড়ন করে সে তো কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই। এখানে 'গোরু' যদিও সাধারণ বিশেষ্য তবু এখানে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা হল। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো : এখানে 'ঝি' 'বৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তবু 'কে' বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এটা বেআইনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইন আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। রাখালসাধারণ গোরু চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যাবসা। কিন্তু গাড়োয়ান গোরুকে যে পীড়ন করে সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বৌ-এর উপকারের জন্যে শাশুড়ি যদি ঝিকে মারে সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়।

ব'লে থাকি 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে তৈরি করে' বলিই নে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে : ময়রা মালপোকে করে তোলে জুতোর সুকতলা। মালপো তৈরি করা সাধারণ ময়রা কর্তৃক সাধারণ ব্যাপার; সুকতলার মতো মালপো তৈরি করাটা নিঃসন্দেহ সাধারণ ব্যাপার নয়।

সর্বনামের প্রসঙ্গে করণকারকের নিয়ম পূর্বেই বলা হয়েছে। অন্য বিশেষ্যপদ সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা। দ্বারা দিয়ে ক'রে : এই তিনটে শব্দ করণকারকের প্রধান উপকরণ। সর্বনামের সঙ্গে অন্য বিশেষ্যপদের একটা প্রভেদ বিভক্তি নিয়ে; সর্বনামে কে, বিশেষ্যে এ। যথা : হাতে মারা ভালো ভাতে মারার চেয়ে, পৃথিবী পূরাবে তুমি ভরতের ধনে। সর্বনামে এই বিভক্তি বিকল্পে 'য়', যেমন : তোমায় দিয়ে। নিম্নের দৃষ্টান্তে কর্মকারকের চিহ্ন দেখি নে, যথা : মন দিয়ে শোনো, হাত দিয়ে খাও, লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও। মন দিয়ে কাজ করো, বাজে কাজে হাত দিয়ো না : এখানে মনও নির্বস্তুক, হাতও তাই; এ হাত দৈহিক হাত নয়, এ হাত বলতে বোঝায় চেষ্টা। লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও : এ লোক কোনো বিশেষ লোক নয়, সাধারণভাবে যাকে হোক কাউকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা হচ্ছে। ঘরামি দিয়ে চাল ছাইতে হবে : এখানে বিকল্পে 'ঘরামিকে দিয়ে'ও হয়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি থাকাই চাই : রামকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ো। মানুষ ছাড়া অন্য জীববাচক বিশেষ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম, যেমন : বাঁদরকে দিয়ে চাষ করানো চলে না, ধোবার গাধাকে দিয়ে ঘোড়দৌড় খেলাবে না কি।

করণকারকে 'ক'রে' শব্দ অধিকরণরূপের সঙ্গে যুক্ত হয় : গ্লাসে ক'রে জল খাও, তুলিতে ক'রে আঁকো।

করণকারকে 'দিয়ে' আর 'ক'রে' শব্দে পার্থক্য আছে। 'পাল্কিতে ক'রে' যাওয়া চলে, 'পাল্কি দিয়ে' চলে না। খাবার বেলায় বলি 'হাতে ক'রে খাও'; নেবার বেলায় বলি 'হাত দিয়ে নাও'।

একটাতে হাত হচ্ছে উপায়, আর-একটাতে হাত হচ্ছে আধার। পাল্কিতে 'ক'রে' মানুষ যায়, কিন্তু যায় পথ 'দিয়ে'। এখানে পাল্কি উপায়, পথ আধার। কিন্তু অর্থহিসাবে বিকল্পে হাত উপায়ও হতে পারে, আধারও হতে পারে। তাই 'হাত দিয়ে খাও' বলাও চলে, 'হাতে ক'রে খাও' বলতেও দোষ নেই।

ব'লে থাকি : বড়ো রাস্তা দিয়ে যখন যাবে গাড়িতে ক'রে যেয়ো। কোনো সাহেব যদি বলে 'রাস্তায় ক'রে যাবার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো', বুঝব সে বাঙালি নয়। লোক 'দিয়ে' পাঠাব চিঠি, লোকটা উপায়: ব্যাগে 'ক'রে' সে চিঠি নেবে, ব্যাগটা আধার।

১৭

'হতে' আর 'থেকে' এই দুটো শব্দ বাংলা অপাদানের সম্বল। প্রাচীন হিন্দিতে 'হতে' শব্দের জুড়ি পাওয়া যায় 'হুন্তো', নেপালিতে 'ভন্দা', সংস্কৃত 'ভবন্ত'। প্রাচীন রামায়ণে দেখেছি : ঘরে হনে, ভূমি হনে।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের অপাদানে পাওয়া যায় : হোংতও হোংতউ। 'থেকে' শব্দটার ধ্বনিসাদৃশ্য পাওয়া যায় নেপালিতে, যেমন: 'তাঁহা দেখি=সেখান থেকে, মাঝ দেখি=মাঝ থেকে। গুজরাটিতে আছে 'থকি'। বাংলায় অপাদানে একটা গ্রাম্য প্রয়োগ আছে 'ঠেঞে' (ঠাঁই হতে), যথা : তোমার ঠেঞে কিছু আদায় করতে হবে।

একদা পালি ব্যাকরণে পেয়েছিলুম 'অজ্জতগ্গে' শব্দ। এর সংস্কৃত মূল 'অদ্যতঃ অগ্রে'; 'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে এর ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে। জানি নে পণ্ডিতদের কাছে এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য হবে কি না।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 'পশুর থেকে মানুষের উৎপত্তি' এ কথা বলা চলে। কিন্তু 'মানুষ থেকে গন্ধ বেরচ্ছে' বলি নে, বলি 'মানুষের গা থেকে' কিংবা 'কাপড় থেকে'। 'বিপিন থেকে

টাকা পেয়েছি' বলা চলে না, বলতে হয় 'বিপিনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি'। এর কারণ, অচেতন পদার্থের নামের সঙ্গেই 'থেকে' শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাই 'মেঘ থেকে' বৃষ্টি নামে, 'পাখি থেকে' গান ওঠে না, 'পাখির কণ্ঠ থেকে' গান ওঠে।

কেবল 'থেকে' নয়, 'হতে' শব্দ-প্রয়োগেও ঐ একই কথা। 'অযোধ্যা' হতে' রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন 'রাবণের কাছ হতে'।

তুলনামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয় : হতে থেকে চেয়ে চাইতে।

অন্য প্রসঙ্গে সম্বন্ধপদের আলোচনা হয়ে গেছে। এক কালে বহু-বচনে সম্বন্ধপদের 'দিগের' শব্দের পূর্বেও সম্বন্ধের আর-একটা বিভক্তি থাকত, যেমন 'আমারদিগের'।

বাংলা সম্বন্ধপদের একটা প্রত্যয় আছে 'কার'। এর ব্যবহার সার্বত্রিক নয়। সময়বাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'এখন', 'তখন' 'যখন' 'কখন'এর সঙ্গে 'কার' জোড়া হয়। বিশেষ কোনো 'বেলাকার' 'দিনকার' 'রাতকার'ও চলে। 'আজ' এবং 'কাল' শব্দে কর্মকারকের বিভক্তির সঙ্গে যোগ ক'রে ওর ব্যবহার : আজকেকার কালকেকার। 'পর্শুকার', অমুক 'হপ্তাকার' বা 'বছরকার' হয়, কিন্তু অমুক 'মাসকার' কিংবা অমুক 'ঘণ্টাকার' হয় না। 'সকলকার' হয়, 'সমস্তকার' হয় না। 'সত্যকার' হয়, 'মিথ্যাকার' হয় না। ভিতরকার বাহিরকার উপরকার নিচেকার এদিককার ওদিককার এধারকার ওধারকার— চলে। ব্যক্তি বা বস্তুবাচক শব্দ সম্পর্কে এর ব্যবহার নেই। 'জন' শব্দ যোগে সংখ্যাবাচক শব্দে 'কার' প্রয়োগ হয় : একজনকার দুজনকার। কিন্তু 'জন' ছাড়া মনুষ্যবাচক আর-কোনো শব্দের সঙ্গে ওর যোগ নেই। 'ইংরেজকার' বলা চলে না।

১৮

হওয়া, থাকা, আর করা, এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে। আমি ধনী, তুমি পণ্ডিত— এ কথা ইংরেজিতে বলতে গেলে এর সঙ্গে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ করতে হয়, বাংলায় সেটা উহ্য থাকে। 'রাস্তাটা সোজা', 'পুকুরটা গভীর', যখন বলি তখন সেটাতে তার নিত্য অবস্থা জানায়। কিন্তু 'বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে'— এটা আকস্মিক অবস্থা, তাই হওয়ার কথাটা তুলতে হয়। ওর লোভ হয়েছে, মনে হচ্ছে ওর জ্বর হবে— বাক্যগুলিও এইরকম।

সাবেক বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনাম -শব্দসহযোগে ইংরেজি is ও are -এর অনুরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়: তুমি কে বটো, সে কে বটে, আমি রাজার ঝিয়ারি বটি। অচেতনবাচক শব্দেও চলত, যেমন: ঐ গাছটা কী বটে, এই নদী গঙ্গাই বটে। 'বটে' শব্দটা এখনো ভাষায় আছে, বিশেষ ঝোঁক দেবার জন্যে, যেমন: লোকটা ধনী বটে। আবার ভঙ্গীর কাজেও লাগে, যেমন: বটে, চালাকি পেয়েছ! 'বটে'র সঙ্গে 'কিন্তু'র যোগ হলে ভঙ্গীটা আরও জমে, যেমন: উনি সর্দারি করেন বটে কিন্তু টের পাবেন। ইংরেজিতে স্বভাব বা অবস্থা বোঝাতে is বা are ব্যতীত বিশেষ্যের গতি নেই, বাংলায় তা নয়। ইংরেজিতে বলাই চাই He is lame. কিন্তু বাংলায় যদি বলি 'সে খোঁড়া বটে' তা হলে হয় বোঝাবে, তার খোঁড়া অবস্থাটা একটা বিশেষ আবিষ্কার, নয় ওর সঙ্গে একটা অসংগত ব্যাপারের যোগ আছে। যেমন : ও খোঁড়া বটে কিন্তু দৌড়য় খুব। কিংবা সন্দেহের বিদ্রূপ প্রকাশ করে : তুমি খোঁড়া বটে। অর্থাৎ, খোঁড়া নও যে তা প্রমাণ করতে পারি।

বাংলায় থাকার কথাটা যখন জানাই তখন বলি— আছি বা আছে, ছিলে, ছিল বা ছিলুম। 'আছিল' শব্দেরই সংক্ষেপ 'ছিল'। কিন্তু ভবিষ্যতের বেলায় হয় 'থাকব'। বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত

এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে করছে করেছিল করছিল— শব্দগুলো 'আছি' ক্রিয়াপদকে ভিত্তি ক'রে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে 'চলা থা', চলেছিল। কাজটা যদিও চলা, তবু থা শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে কাজকে নির্দেশ করা হচ্ছে প্রধানত সেই কাজের মূল ধাতুকে দিয়েই ক্রিয়াপদের গড়ন। 'খা' ধাতুতে খাওয়া বোঝায়, খাওয়া কাজের সমস্ত ক্রিয়ারূপ এই ধাতুর যোগেই তৈরি। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেক-স্থলে কার্যটা ক্রিয়ার রূপ ধরে নি। ক্ষুধা পাওয়া, তৃষ্ণা পাওয়া, প্রতি দিনের ঘটনা; অথচ বাংলায় সেটা ক্রিয়ারূপ নেয় নি, বিশেষ্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বলতে হয় : ক্ষুধা পেল, তৃষ্ণা পেল। হওয়া উচিত ছিল 'ক্ষুধিল' 'তৃষিল', কাব্যে এইরকম ক্রিয়ারূপের কোনো বাধা নেই। কিন্তু গদ্যবাংলায় ক্রিয়াপদকে অনেক স্থলে গোটা বিশেষ্যপদের ভার বয়ে বেড়াতে হয়।

বাংলায় দুটো ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ গড়ার একটা রীতি আছে। তাতে যে ইঙ্গিতের ভাষা তৈরি হয়েছে তার ভাবপ্রকাশের শক্তি অসাধারণ। সামান্য এই কথাটা 'রয়ে বসে কাজ করা' যা বলে তা কোনো বাঁধা সংস্কৃত শব্দে বলাই যায় না। 'উঠেপ'ড়ে' 'উঠেহেঁটে' কিংবা 'নেচেকুঁদে' বেড়ানোতে যে ফুর্তি প্রকাশ পায় সেটার ঠিক উপযুক্ত শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের স্বজাতীয় শব্দ : তেড়েফুঁড়ে কেটেছেঁটে বেঁচেবর্তে রয়েসয়ে হেসেখেলে। এমন আরও বিস্তর আছে। অনেক স্থলে ঐ জোড়া শব্দের দুটিতে অর্থের সাম্য থাকে না। বস্তুত ওগুলো শব্দযোজনার একরকম খেপামি। 'বেয়েছেয়ে দেখা'য় যা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে বাওয়া এবং ছাওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। যখন বলি 'নেড়েচেড়ে দেখতে হবে' তখন 'নেড়ে' শব্দের সহচরটিকে ব্যবহার করা হয় অর্থহীন বাটখারার

মতো ওজন ভারি করবার জন্যে। চেয়েচিন্তে কেঁদেকেটে : এরা আছে অনুপ্রাসের গাঁঠ বাঁধার কাজে। এঁটেসেঁটে খেটেখুটে খেয়েদেয়ে ঠেলেঠুলে : এরা ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে মনকে ঠেলে দেবার কাজ করে।

আর-একরকম ক্রিয়াবিশেষণ আছে পদকে দুনো করে দিয়ে। যেমন, 'জ্বর হবে হবে' কিংবা 'জ্বর জ্বর করছে'। মনটা 'পালাই পালাই' করে। এর মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা অর্থাৎ হওয়ার কাছাকাছি ভাব আছে। 'লড়াই লড়াই খেলা' সত্যিকার লড়াই নয় কিন্তু যেন লড়াই। 'হতে হতে হল না' অর্থাৎ হতে গিয়ে হল না। এতে যেমন জোর কমায়, আবার কোনো স্থলে জোর বাড়ায় : দেখতে দেখতে জল বেড়ে গেল, হাতে হাতে ফল পাওয়া। সরে সরে যাওয়া, চলে চলে ক্লান্ত, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, পিছু পিছু চলা, কাছে কাছে থাকা : এই দ্বিত্বে নিরন্তরতার ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু একটানা নিরন্তরতা নয়, এর মধ্যে একটা বারংবারত্ব আছে। 'পাতে-পাতেই মাছের মুড়ো দেওয়া হয়েছে' বললে মনে হয় সেটা যেন একে একে পরে পরে গণনীয়। 'পাথরটা পড়ি পড়ি করছে', কোনো কালেই হয়তো পড়বে না, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বারে বারে তার ভাবখানা পড়বার মতো। 'আপনি আপনিই তিনি বকে যাচ্ছেন' বললে কেবল যে স্বগত বকা বোঝায় তা নয়, বোঝায় পুনঃ পুনঃ বকা। এরকম ভাবব্যঞ্জনা কোনো স্পষ্টার্থক বিশেষণের দ্বারা সম্ভব নয়। এ যেন সিনেমায় ছবি নেওয়ার প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ অনুভূতির সমষ্টি।

ক্রিয়ার বিশেষণে অর্থহীন ধ্বনি সম্বন্ধে বাংলাশব্দতত্ত্ব বইখানিতে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি, যেমন : ফস্‌ ক'রে, চট্‌ ক'রে, ধুপ্‌ ক'রে, ধাঁ ক'রে, সোঁ ক'রে, ঢ্যাঁচ্‌ ক'রে দেওয়া, গ্যাঁট্‌ হয়ে বসা, ঢিপ্‌ ক'রে প্রণাম করা। এদের কোনো শব্দই সার্থক নয় অথচ অর্থবান শব্দের চেয়ে এরা স্পষ্ট করে মনে রেখাপাত করে। ঝাঁ-ঝাঁ

করছে রোদ্দুর, ধু-ধু করছে মাঠ, থই-থই করছে জল : এরা এক আঁচড়ের ছবি।

শারীরিক বেদনাগুলি ইংরেজি ভাষায় অর্থবান শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়, যেমন : throbbing, cutting, gnawing, pricking ইত্যাদি। এরকম দৈহিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বাংলাভাষায় নেই। বাংলার আছে ধ্বনি : দব্দব্ ঝন্ঝন্ টন্টন্ কন্কন্ কুট্কুট্ কর্কর্ তিড়িক্তিড়িক্ ঘিন্ঘিন্ ঝিম্ঝিম্ সুড়্সুড়্ সির্সির্। এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অনুভূতির কোনোই শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয় এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।

বাংলা ক্রিয়াপদে আর-এক বিশেষত্ব আছে দুটো ক্রিয়ার জোড় দেওয়া, তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি না থাকলেও, যেমন : হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা; করে যাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া, করে চলা, করে ওঠা, করতে থাকা। হয়ে পড়া, করে ফেলা-র ভাবটা একই; একটা অক্রিয়, একটা সক্রিয়। আর-একরকম আছে বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা দুই ক্রিয়ার অসংগত যোগ, যেমন : মার খাওয়া, উঠে পড়া, গাল দেওয়া, বসে যাওয়া, ঘুরে মরা, গিয়ে পড়া, খেয়ে বাঁচা, নেড়ে দেওয়া।

১৯

ক্রিয়াপদে দু রকমের অনুজ্ঞা আছে। এক, উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুরোধ বা আদেশ করা। আর, উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমন 'ও করুক'।

হোক যাক চলুক বা করুক প্রভৃতি শব্দগুলিতে ক প্রত্যয় পুরোনো ভাষায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল না, যথা : জাউ, মন্দ পবন বহু, উদিত হউ চন্দা, মউরগণ নাদ করু।

পূর্বেই বলেছি বাংলাভাষার প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য। উপরোক্ত শ্রেণীর ক্রিয়াপদে একটা অনর্থক 'গে' শব্দের যোগে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের দ্বারা হয় না, যথা : হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে ঔদাসীন্যে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না। কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মুদ্রা। 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয় : Let it happen, I don't care. ওর সঙ্গে 'তুমিও যেমন' যদি যোগ করা যায় তা হলে ভঙ্গিমা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্যে হয়তো এর কাছাকাছি যায় : Oh let it be, don't bother. মোটের উপর এই শব্দভঙ্গীর ভাবখানা এই যে, যা হচ্ছে বা করা হচ্ছে সেটা ভালো নয়, সেটা ক্ষতিকর, বা অপ্রিয়, কিন্তু তবু ওটাকে গ্রাহ্য করার দরকার নেই। 'মরুকগে' শব্দে এই ভাষাভঙ্গী খুবই স্পষ্ট হয়েছে। এই ছোট্ট বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিবাক্য: Hang it, let it go to the dogs.

ইংরেজিতে সাধারণ ব্যবহারের ক্রিয়াপদ অনুজ্ঞায় প্রায়ই এক মাত্রার হয়, যেমন, run, stop, cut, beat, shoot, march, hold, throw. যেখানে যুগ্ম ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় সেখানে এক মাত্রায় দুটি শব্দ জোড়া লাগে, যেমন : come in, go out, cut down, stand up, run on ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইরূপ সংক্ষিপ্ত শব্দে আজ্ঞার জোর পৌঁছয়। স্কাউটের বা ফৌজের কুচকাওয়াজে ইংরেজিতে যে-সব আদেশবাক্য আছে এই কারণে সেগুলো জোরালো হয়। যে-সকল শব্দ ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ হয় তারা ধাক্কা দেয় জোরে। stand up শব্দ উভয়ে মিলে দুই মাত্রার বটে কিন্তু তাতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণের দুটো ঠোকর আছে।

'দাঁড়াও' শব্দটাও দুই মাত্রার, কিন্তু তার আগাগোড়া স্বরবর্ণ, তাদের স্পর্শ মোলায়েম। কথাটা ধাঁ করে ছোটে না।

'তুই' 'তোরা' বর্গের অনুজ্ঞায় এই দুর্বলতা নেই। বোস্‌ ওঠ্‌

ছোট্ থাম্ কাট্ মার্ ধর্ খেল্ : এগুলি দৌড়দার শব্দ। আদিকালে ভাষায় 'তু' 'তুই' ছিল একমাত্র মধ্যমপুরুষের সর্বনাম শব্দ। . সেটা যদি চলে আসত তা হলে ক্রিয়াপদকে স্বরবর্ণ এমন নরম করে রাখত না, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে তাকে তীক্ষ্ণতা দিত। 'করো' হ'ত 'কর্'। 'কোরো' হ'ত 'করিস'। 'দাঁড়া' শব্দ যদিও স্বরবর্ণ বহন করে তবু 'দাঁড়াও' শব্দের চেয়ে তার মধ্যে প্রভুশক্তি বেশি। 'ঘুমো' আর 'ঘুমোও' তুলনা করলে অনুজ্ঞার দিক থেকে প্রথমোক্তটির প্রবলতা মানতে হয়।

চলতি বাংলা ভঙ্গীপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ, ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগত ভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা।

'হোক না' 'করোই না' ক্রিয়াপদে 'না' শব্দে নির্বন্ধ প্রকাশ পায়, কোনো-এক পক্ষের অনিচ্ছাকে যেন ঠেলে দেওয়া। 'না' শব্দের দ্বারা 'হাঁ' প্রকাশ করা আর প্রথমপুরুষ-বাচক 'আপনি'কে মধ্যমপুরুষের অর্থে ব্যবহার একই মনস্তত্ত্বমূলক। যিনি উপস্থিত আছেন যেন তিনি উপস্থিত নেই, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় কথা বলার স্পর্ধা বক্তার পক্ষে সম্ভব নয়, এই ভাণের দ্বারাই তাঁর উপস্থিতির মূল্য যায় বেড়ে। তেমনি অনুরোধ জানানোর পরক্ষণেই 'না' বলে তার প্রতিবাদ ক'রে অনুরোধের মধ্যে সম্মানের কাকুতি এনে দেওয়া হয়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলাভাষার আর-একটি বিশেষত্ব, যথা : আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন; আমি নেই, তুমি নেই, সে নেই, তিনি নেই; হই নে, হও না, হয় না, হন না, হয় নি, হন নি।

বাংলা ক্রিয়াপদে নানারকম শব্দ-যোজনায় নানারকম ভঙ্গী। তার কতকগুলি সার্থক, কতকগুলি নিরর্থক। ক্রিয়াপদে এতরকম ইশারা বোধ হয় আর-কোনো ভাষায় নেই।

পড়ল-বা, করলে-বা, শব্দে আশঙ্কার সূচনা। কোনো ক্রিয়া-বিশেষণ-যোগে এর ভাবটা প্রকাশ হতে পারত না।

এতে যদি ইকার যোগ করা যায় তাতে আর-একরকম ভঙ্গী এসে পড়ে। হলই-বা, করলই-বা : এর ভঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য অনুসারে ক্ষমাও বোঝাতে পারে, স্পর্ধাও বোঝাতে পারে, উপেক্ষাও বোঝাতে পারে।

হল বুঝি, করল বুঝি, হল ব'লে, করল ব'লে : আসন্ন অপ্রিয়তার আশঙ্কা।

হল যে, করল যে : উদ্‌বেগ।

হল তো, করলে তো : অপ্রত্যাশিতের সম্বন্ধে বিস্ময়।

আবার ওকেই প্রশ্নের সুরে বদলিয়ে যদি বলা হয় 'হল তো?' তা হলে জানানো হয় : এখন তো আর কোনো নালিশ রইল না?

হোক্-না, করুক-না, হোক্‌গে, করুক্‌গে, মরুক্‌গে : ঔদাসীন্য।

হলই-বা, করলই-বা, নাই-বা হল, না-হয় হল : স্পর্ধার ভাষা।

হবে-বা, হবেও-বা : দ্বিধা এবং স্বীকার মিশিয়ে।

হবেই হবে, করবেই করবে : সুনিশ্চিত প্রত্যাশা।

করতেই হবে, হতেই হবে, করাই চাই, হওয়াই চাই : ইচ্ছার জোর প্রয়োগ।

হলেই হল : অর্থাৎ হয় যদি তবে আর-কোনো তর্কের দরকার নেই।

হোকগে ছাই, মরুগকে ছাই : প্রবল ঔদাস্য।

২০

অব্যয়। বাংলা ভাষায় প্রশ্নসূচক অব্যয় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রশ্নসূচক 'কি' শব্দের অনুরূপ আর-একটি 'কি' আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে, যেমন : কী তোমার ছিরি, কী-যে তোমার বুদ্ধি।

তিনটি আছে যোজক অব্যয় শব্দ : এবং, আর, ও। 'এবং' সংস্কৃত শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ 'এইমতো'। ইংরেজি and শব্দের অর্থে কতদিন এর ব্যবহার চলেছে জানি নে। পুরোনো কাব্যসাহিত্যে 'এবং' শব্দের দেখা পাই নি। আধুনিক কাব্যসাহিত্যেও এর ব্যবহার নেই বললেই হয়। খাঁটি বাংলা যোজক শব্দ 'আর', হিন্দি 'ঔর'। সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে এর উদ্ভব। 'এবং' শব্দ তার অর্থের অসংগতি সত্ত্বেও পুরাতন 'আর'কে সাধু ভাষা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়ানো সহজ হয়েছে তার প্রধান কারণ, স্বাভাবিক বাংলায় দ্বন্দ্বসমাসেই যোজকের কাজ সারা হয়ে থাকে। আমরা বলি : হাতিঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে রাজা চলেছেন। আমরা বলি : চৌকি-টেবিল আয়না-আলমারিতে ঘর ঠাসা। ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা and না বসিয়ে চলে না, যথা : The king marches with his elephants, horses and soldiers. The room is full of chairs, tables, clothes-racks and almirahs.

বাংলায় যদি বলি 'রাস্তা দিয়ে চলেছে হাতি আর ঘোড়া', তা হলে বোঝাবে বিশেষ করে ওরাই চলেছে।

'আর' শব্দের আরও কয়েকটি কাজ আছে, যেমন : আর কত খাবে : অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও কত খাবে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না : অর্থাৎ পুনশ্চ দেখা হবে না।

তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না : এ একটা ভঙ্গীওয়ালা কথা। এই শব্দ থেকে 'আর' শব্দটা বাদ দিলেও চলে, কিন্তু তাতে ঝাঁজ মরে যায়।

সাহিত্যে 'ও' শব্দটা 'এবং' শব্দের সমান পর্যায়ে চলেছে। কিন্তু চলতি ভাষায় 'ও' সংস্কৃত 'চ'এর মতো, যথা : আমি যাচ্ছি তুমিও যাবে, অ্যাঙ যায় ব্যাঙ যায় খল্‌সে বলে আমিও যাব।

এক কালে এই 'ও' ছিল 'হ' রূপে, যেমন : সেহ, এহ বাহ্য, এহ তো মানুষ নয়। এই হ অবিকৃত রূপে বাকি আছে সাধু ভাষায়

'কেহ' শব্দে। চলতি ভাষায় 'কেও' থেকে ক্রমে 'কেউ' হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে 'কেহু' পাওয়া যায়, 'তেঁহ' শব্দটা আজ হয়েছে 'তিনি'। 'ওহ' নেই কিন্তু সাধু ভাষায় 'উহা' আছে। 'যেহ' নেই, আছে 'যাহা'। এই শেষ দুটি বিশেষণ অপ্রাণী সম্পর্কে।

যোজক 'ও'র উৎপত্তি ফার্সি উঅ (অন্তস্থ ব) শব্দ থেকে, সুতরাং and'-এর প্রতিশব্দরূপে এর ব্যবহার অবৈধ নয়। কিন্তু তবু ভাষায় ভালো করে মিশ খায় নি। তুমি ও আমি একসঙ্গেই যাব : এ খাঁটি বাংলা নয়। আমরা সহজে বলি : তুমি আমি একসঙ্গেই যাব। কেউ কেউ মনে করেন 'অপি' থেকে 'ও' হয়েছে, কিন্তু স্বরবিকারের নিয়ম অনুসারে সেটা সম্ভব কি না সন্দেহ করি।

রাজাও চলেছে সন্ন্যাসীও চলেছে : এ খাঁটি বাংলা। কিন্তু 'রাজা ও সন্ন্যাসী চলেছে' কানে ঠিক লাগে না। সে এগোয়ও না পিছোয়ও না : 'ও' শব্দের এই যথার্থ ব্যবহার। সে এগোয় না ও পিছোয় না : এ বাক্যটা দুর্বল।

তুমিও যেমন, হবেও-বা : এ-সব জায়গায় 'ও' ভাষাভঙ্গীর সহায়তা করে।

দেখা যায় 'এবং' শব্দটাকে দিয়ে আমরা অনেক স্থানে and শব্দের অনুকরণ করাই। He has a party of enemies and they vilify him in the newspapers. এ বাক্যটা ইংরেজি মতে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা যখন ওরই তর্জমা করে বলি 'তাঁর একদল শত্রু আছে এবং ওরা খবরের কাগজে তাঁর নিন্দে করে', তখন বোঝা উচিত এটা বাংলারীতি নয়। আমরা এখানে 'এবং' বাদ দিই। He has enemies and they are subsidised by the government. এই বাক্যটা তর্জমা করবার সময় ফস্ করে বলা অসম্ভব নয় যে : তাঁর শত্রু আছে এবং তারা সরকারের বেতনভোগী। কিন্তু ওটা ঠিক হবে না, 'এবং' পরিত্যাগ করতে হবে। বাক্যের এক অংশে 'থাকা', আর-এক অংশে 'হওয়া'; এদের মাঝখানে

'এবং' মধ্যস্থতা করবার অধিকার রাখে না। তিনি হচ্ছেন পাকা জোচ্চোর, এবং তিনি নোট জাল করেন : ইংরেজিতে চলে, বাংলায় চলে না।

'সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ' এ চলে, 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভেনে খায়' এও চলে। কারণ প্রথম বাক্যের দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষ বাক্যের দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক। কিন্তু 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভেনে খায়' এ ভালো বাংলা নয়। আমরা বলি : সে দরিদ্র, ধান ভেনে খায়। ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে : She is poor and lives by husking rice.

প্রয়োগবিশেষে 'যে' সর্বনামশব্দ ধরে অব্যয়রূপ, যেমন : হরি যে গেল না। 'যে' শব্দ 'গেল না' ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে দিল। তিনি বললেন যে, আজই তাঁকে যেতে হবে : 'তাঁকে যেতে হবে' বাক্যটাকে 'যে' শব্দ যেন ঘের দিয়ে স্বতন্ত্র করে দিলে। শুধু উক্তি নয় ঘটনাবিশেষকেও নির্দিষ্ট করা তার কাজ, যেমন : মধু যে রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় আমি জানতুম না। মধু বিকেলে বেড়াতে যায়, এই ব্যাপারটা 'যে' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হল।

আর-একটা অব্যয় শব্দ আছে 'ই'। 'ও' শব্দটা মিলন জানায়, 'ই' শব্দ জানায় স্বাতন্ত্র্য। 'তুমিও যাবে', অর্থাৎ মিলিত হয়ে যাবে। 'তুমিই যাবে', অর্থাৎ একলা যাবে। 'সে যাবেই ঠিক করেছে', অর্থাৎ তার যাওয়াটাই একান্ত। 'ও' দেয় জুড়ে 'ই' ছিঁড়ে আনে।

বক্রোক্তির কাজেও 'ই'কে লাগানো হয়েছে : কী কাণ্ডই করলে, কী বাঁদরামিই শিখেছ। 'কী শোভাই হয়েছে' ভালোভাবে বলা চলে, কিন্তু মন্দভাবে বলা আরও চলে। এর সঙ্গে 'টা' জুড়ে দিলে তীক্ষ্ণতা আরও বাড়ে, যেমন : কী ঠকানটাই ঠকিয়েছে। আমরা সোজা ভাষায় প্রশংসা করে থাকি : কী চমৎকার, কী সুন্দর। ওর সঙ্গে একটু-আধটু ভঙ্গিমা জুড়ে দিলেই হয়ে দাঁড়ায় বিদ্রূপ।

'তা' শব্দটা কোথাও সর্বনাম কোথাও অব্যয়। তুমি যে না বলে

যাবে তা হবে না : এখানে না বলে যাওয়ার প্রতিনিধি হচ্ছে তা; অতএব 'সর্বনাম'। তা, তুমি বরং গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো : এই 'তা' অব্যয় এবং অর্থহীন, না থাকলেও চলে। তবু মনে হয় একটুখানি ঠেলা দেবার জন্যে যেন প্রয়োজন আছে। তা, এক কাজ করলে হয় : একটা বিশেষ কাজের দিকটা ধরিয়ে দিল ঐ 'তা'।

'বুঝি', সহজ অর্থ 'বোধ করি'। অথচ বাংলা ভাষায় 'বুঝি' 'বোধ করি' 'বোধ হচ্ছে' বললে সংশয়যুক্ত অনুমান বোঝায় : লোকটা বুঝি কালা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে। 'তুমি কি যাবে' এই বাক্যে 'কি' অব্যয়ে সুস্পষ্ট প্রশ্ন। কিন্তু 'তুমি বুঝি যাবে' এই প্রশ্নে যাবে কি না সন্দেহ করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 'বুঝি' শব্দে বুঝি ভাবটাকে অনিশ্চিত করে রাখে। বুঝির সঙ্গে 'বা' জুড়ে দিলে তাতে অনুমানের সুরটা আরও প্রবল হয়।

যদি, যদি-বা, যদিই-বা, যদিও-বা। যদি অন্যায় কর শাস্তি পাবে : এটা একটা সাধারণ বাক্য। যদি-বা অন্যায় ক'রে থাকি : এর মধ্যে একটু ফাঁক আছে, অর্থাৎ না করার সম্ভাবনা নেই-যে তা নয়। যদিই-বা অন্যায় করে থাকি : অন্যায় করাটা নিশ্চিত বলে ধরে নিলেও আরও কিছু বলবার আছে। যদিও-বা অন্যায় করে থাকি : অন্যায় সত্ত্বেও স্পর্ধা আছে মনে।

'তো' অব্যয়শব্দে অনেক স্থলে 'তবু' বোঝায়, যেমন : বেলায় এলে তো খেলে না কেন। কিন্তু, তুমি তো বলেই খালাস, সে তো হেসেই অজ্ঞান, আমি তো ভালো মনে করেই তাকে ডেকেছিলুম, তুমি তো বেশ লোক, সে তো মস্ত পণ্ডিত— এ-সব স্থলে 'তো' শব্দে একটু ভর্ৎসনার বা বিস্ময়ের আভাস লাগে, যথা : তুমি তো গেলে না, সে তো বসেই রইল, তবে তো দেখছি মাটি হল।

'গো' শব্দের প্রয়োগ সম্বোধনে 'তুমি' বর্গের মানুষ সম্বন্ধে, 'তুই' বা 'আপনি' বর্গের নয় : কেন গো, মশায় গো, কী গো, ওগো শুনে যাও, হাঁ গো তোমার হল কী। সংস্কৃত 'ভোঃ' শব্দের মতো।

এর বহুল ব্যবহার নেই। হাঁ গো, না গো : মুখের কথায় চলে; মেয়েদের মুখেই বেশি। ভয় কিংবা ঘৃণা -প্রকাশে 'মা গো'। 'বাবা গো' শুধু ভয়-প্রকাশে। 'শোনো' শব্দের প্রতি 'গো' যোগ দিয়ে অনুরোধে মিনতির সুর লাগানো যায়। 'কী গো' 'কেন গো' শব্দে বিদ্রূপ চলে : কেন গো, এত রাগ কেন; কেন গো, তোমার যে দেখি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; কী গো, এত রাগ কেন গো মশায়; কী গো, হল কী তোমার। ভয় বা দুঃখ -প্রকাশে মেয়েদের মুখে 'কী হবে গো', কিংবা অনুনয়ে 'একা ফেলে যেয়ো না গো'। 'হাঁগা' 'কেনে গা' গ্রাম্য ভাষায়।

শুধু 'হে' শব্দ আহ্বান অর্থে সাহিত্যেই আছে। মুখের কথায় চলে 'ওহে'। কিংবা প্রশ্নের ভাবে : কে হে, কেন হে, কী হে। অনুজ্ঞায় 'চলো হে'। মাননীয়দের সম্বন্ধে এই 'ওহে'র ব্যবহার নেই। 'তুমি' 'তোমার' সঙ্গেই এর চল, 'আপনি' বা 'তুই' শব্দের সঙ্গে নয়।

'রে' শব্দ অসম্মানে কিংবা স্নেহপ্রকাশে : হাঁ রে, কেন রে, ওরে বেটা ভূত, ওরে হতভাগা, ওরে সর্বনেশে। এর সম্বন্ধ 'তুই' 'তোরা'র সঙ্গে।

'লো' 'লা' মেয়েদের মুখের সম্বোধন। এও 'তুই' শব্দের যোগে। ভদ্রমহল থেকে ক্রমশ এর চলন গেছে উঠে।

অব্যয় শব্দ আরও অনেক আছে, কিন্তু এইখানেই শেষ করা যাক।

২১

ভাষার প্রকৃতির মধ্যে একটা গৃহিণীপনা আছে। নতুন শব্দ বানাবার সময় অনেক স্থলেই একই শব্দে কিছু মালমসলা যোগ ক'রে কিংবা দুটো-তিনটে শব্দ পাশাপাশি আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়, নইলে তার ভাণ্ডারে জায়গা হত না। এই কাজে সংস্কৃত ভাষার নৈপুণ্য অসাধারণ। ব্যবস্থাবন্ধনের নিয়মে

তার মতো সতর্কতা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় নিয়মের খবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলো নির্মাণরীতি বানিয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে সমাসের পর্যায়ে ফেলা যায়, যেমন: চটামেজাজ নাকিসুর তোলাউনুন ভোলামন। এগুলো হল বিশেষ্য-বিশেষণের জোড়। বিশেষণগুলোও ক্রিয়াপদকে প্রত্যয়ের শান দিয়ে বসানো। সেও একটা মিতব্যয়িতার কৌশল। বদ্‌মেজাজি ভালো-মানুষি তিনমহলা, এগারোহাতি (শাড়ি): এখানে জোড়া শব্দের শেষ অংশীদারের পিঠে ইকারের আকারের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাকে এক শ্রেণীর বিশেষ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আর-এক শ্রেণীর বিশেষ্যে। অবশেষে সেই বিশেষ্যের গোড়ার দিকে বিশেষণ যোগ ক'রে তাকে বিশেষত্ব দিয়েছে। অবিকৃত বিশেষ্য-বিশেষণের মিলন ঘটানো হয়েছে সহজেই; তার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য গেঁথে সংস্কৃত বহুব্রীহি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের মতো এক-একটা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন 'পুজোবাড়ি', অর্থাৎ পুজো হচ্ছে যে বাড়িতে সেই বাড়ি। কাঠকয়লা: কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় সেই কয়লা। হাঁটুজল: হাঁটু পর্যন্ত গভীর যে জল সেই জল। মাটকোঠা: মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে যে কোঠা। দুই বিশেষণের যোগে যে সমাস তারও গ্রন্থি ছাড়িয়ে দিলে অর্থের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হয়ে পড়ে; যেমন: কাঁচামিঠে: কাঁচা তবুও মিষ্টি। বাদশাহি-কুঁড়ে: বাদশার সমতুল্য তার কুঁড়েমি। সেয়ানা-বোকা: লোকটাকে বোকার মতো দেখায় কিন্তু আসলে সেয়ানা। বিশেষ্য এবং ক্রিয়া থেকে বিশেষণ-করা শব্দের যোগ, যেমন: পটলচেরা: অর্থাৎ পটল চিরলে যে গড়ন পাওয়া যায় সেই গড়নের। কাঠঠোকরা: কাঠে যে ঠোকর মারে। চুলচেরা: চুল চিরলে সে যত সূক্ষ্ম হয় তত সূক্ষ্ম।

কিন্তু শব্দরচনায় বাংলা ভাষার নিজের বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা করা যাক।

বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।

অর্থহীন ধ্বনিসমবায়ে শব্দরচনার দিকে এই ভাষায় যে ঝোঁক আছে তার আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থজালে ধরা দিতে চায় না বাংলা ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে ছাড়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, আভিধানিক শাসনকে লঙ্ঘন ক'রে সে বোবার প্রকাশ-প্রণালীকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। পোকা কিল্‌বিল্‌ করছে : এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। 'খিট্‌খিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish; কিন্তু 'খিট্‌খিটে' শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুর্‌চুর্‌ হওয়া, কট্‌মট্‌ ক'রে তাকানো, ধপাস্‌ ক'রে পড়া, পা টন্‌ টন্‌ করা, গা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করা : ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্‌ছম্‌ করা'; আমার তো মনে হয় বাংলারই জিত। গুটি-কয়েক রঙের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া যায় : টুক্‌টুকে টক্‌টকে দগ্‌দগে লাল, ধব্‌ধবে ফ্যাক্‌ফেকে ফ্যাট্‌ফেটে সাদা, মিস্‌মিসে কুচ্‌কুচে কালো।

বাংলায় শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়ে যে ভাবপ্রকাশের রীতি আছে সেও একটা ইশারার ভঙ্গী, যেমন : টাটকা-টাটকা গরম-গরম শীত-শীত মেঘ-মেঘ জ্বর-জ্বর যাব-যাব উঠি-উঠি। অর্থের অসংগতি, অত্যুক্তি, রূপক-ব্যবহার, তাতেও প্রকাশ হয় ভঙ্গীর চাঞ্চল্য; অন্য ভাষাতেও আছে, কিন্তু বাংলায় আছে প্রচুর পরিমাণে।

আকাশ থেকে পড়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, হাড় কালী করে দেওয়া, পিটিয়ে লম্বা করা, তেসে দেওয়া, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো, তেলে বেগুনে জ্বলা, পিত্তি জ্বলে

যাওয়া, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, ঘেন্না পিত্তি, বুদ্ধির ঢেঁকি, পাড়া মাথায় করা; তুলো ধুনে দেওয়া, ঘোল খাইয়ে দেওয়া, হেসে কুরুক্ষেত্র, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছেঁড়া, কিল খেয়ে কিল চুরি, আদায় কাঁচকলায়, আহ্লাদে আটখানা : এমন বিস্তর আছে।

বাংলায় অনেক জোড়া শব্দ আছে যার এক অংশে অর্থ, অন্য অংশে নিরর্থকতা। তাতে করে অর্থের চারি দিকে একটা ঝাপসা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে; সেই জায়গাটাতে যা তা কল্পনা করবার উপায় থাকে।

আমরা বলি 'ওষুধপত্র'। 'ওষুধ' বলতে কী বোঝায় তা জানা আছে, কিন্তু 'পত্রটা' যে কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। ওটুকু অব্যক্তই রেখে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ওতে অনেক কিছুই বোঝাতে পারে। হয়তো ফীভার্‌মিক্‌শ্চারের সঙ্গে মকরধ্বজ, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন, থর্মমীটর, কুইনীনের বড়ি, হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের বাক্স। হয়তো তাও নয়। হয়তো কেবলমাত্র দু বোতল ড়ি-গুপ্ত। এমনি 'মালপত্র' 'দলিলপত্র' বিছানাপত্র' প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত অব্যক্তের যুগলামলন।

আর-একরকম জোড়মেলানো শব্দ আছে যেখানে দুই ভাগেরই এক মানে, কিংবা প্রায় সমান মানে; যেমন 'লোকলস্কর'। এই 'লস্কর' শব্দে সব জায়গাতেই যে ফৌজ বোঝাবেই তা নয়; প্রায় ওতে 'লোক' শব্দের অর্থের সঙ্গে অনির্দিষ্ট লোকসঙ্ঘের ব্যাপকতা বোঝায়। অন্যরকম করে বলতে গেলে হয়ত বলতুম, হাজার হাজার লোক চলেছে; অথচ গুণে দেখলে হয়ত আড়াইশো'র বেশি লোক পাওয়া যেত না।

খুব 'চড়চাপড়' লাগালে : ওর মধ্যে চড়টা সুনিশ্চিত, চাপড়টা অনিশ্চিত। ওটা কি তবে একবার গালে চড়, একবার পিঠে চাপড়। খুব সম্ভব তা নয়। তবে কি অনেকগুলো চড়। হতেও পারে।

মারাধরা, মারধোর : বর্ণিত ঘটনায় শুধু হয়তো মারাই হয়েছিল

কিন্তু ধরা হয় নি। কিন্তু 'মারধোর' শব্দের দ্বারা মারটাকে সুনির্দিষ্ট সীমার বাইরে ব্যাপ্ত করা হল। যে উৎপাতটা ঘটেছিল তার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশগুলো এই শব্দে ইঙ্গিতের মধ্যে সেরে দেওয়া হয়েছে।

'কালিকিষ্টি' এটা একটা ভঙ্গীওয়ালা কথা। শুধু 'কালো' বলে যখন মনে তৃপ্তি হয় না তখন তার সঙ্গে 'কিষ্টি' যোগ করে কালিমাকে আরও অবজ্ঞায় ঘনিয়ে তোলা হয়।

ভাবনাচিন্তা আপদবিপদ কাটাছাঁটা হাঁকডাক শব্দে অর্থের বিস্তার করে। শুধু 'চিন্তা' দুঃখজনক, কিন্তু 'ভাবনাচিন্তা' বিচিত্র এবং দীর্ঘায়িত।

স্বতন্ত্র শব্দে 'আপদ' কিংবা 'বিপদ' বলতে যে বিশেষ ঘটনা বোঝায়, যুক্ত শব্দে ঠিক তা বোঝায় না। 'আপদবিপদ' সমষ্টিগত, ওর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে নানাপ্রকার দুর্যোগের সম্ভাবনার সংকেত আছে।

'ধারধোর' শব্দে ধার করার উপরেও আর কিছু অস্পষ্টভাবে উদ্যুক্ত থাকে। হয়তো, কাউকে ধ'রে পড়া। রূপক অর্থে শুধু 'ছাই' শব্দে তুচ্ছতা বোঝায় যথেষ্ট, এই অর্থে 'ছাই' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন : কী ছাই বকছ। কিন্তু 'ছাইভস্ম কী যে বকছ', এতে প্রলাপের বহর যেন বড়ো করে দেখানো হয়।

'হাঁড়িকুঁড়ি' শব্দ সংক্ষেপে পাকশালার বহুবিধ আয়োজনের ছবি এনে দেয়। এরকম স্থলে তন্নতন্ন বর্ণনার চেয়ে অস্পষ্ট বর্ণনার প্রভাব বেশি। 'মামলা-মকদ্দমা' শব্দটা ব্রিটিশ আদালতের দীর্ঘ-প্রলম্বিত বিপত্তির দ্বিপদী প্রতীক। এইজাতীয় শব্দের কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল : মাথামুণ্ডু মালমসলা গোনাগুন্তি চালচলন বাঁধাছাঁদা হাসিতামাশা বিয়েথাওয়া দেওয়াথোওয়া বেঁটেখাটো পাকাপোক্ত মায়াদয়া ছুটোছাটা কুটোকাটা কাঁটাখোঁচা ঘোরাফেরা নাচাকোঁদা জাঁকজমক গড়াপেটা জানাশোনা চাষাভুষো দাবিদাওয়া অদলবদল ছেলেপুলে নাতিপুতি।

২২

চলতি বাংলার আর-একটি বিশেষত্ব জানিয়ে দিয়ে এ বই শেষ করি। যাঁরা সাধু ভাষায় গদ্যসাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিন্যাসের একটা ধারা বাঁধা হয়েছিল।

তার প্রয়োজন নিয়ে তর্ক নেই। আমার বক্তব্য এই যে, এ বাঁধাবাঁধি বাংলা চলতি ভাষার নয়।

কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার: প্রথম পাঁচটি বাক্যে 'গেলেন' ক্রিয়াপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে 'কোথায়' শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও তোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁদে : সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরও বেশি জোর পেঁছয়। যা থাকে অদৃষ্টে, যা করেন ভগবান, সে প'ড়ে আছে পিছনে : এ আমরা কেবল-যে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে।

বাংলা ভাষার একটা বিপদ তার ক্রিয়াপদ নিয়ে; 'ইল' 'তেছে' 'ছিল' -যোগে বিশেষ বিশেষ কালবাচক ক্রিয়ার সমাপ্তি। ক্রিয়াপদের এই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে লেখকদের সতর্ক থাকতে হয়। বাংলা বাক্যবিন্যাসে যদি স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু তাই বলে স্বৈরাচার নেই। 'ভাসিয়ে একেবারে দিলে কেঁদে' কিংবা 'ভাসিয়ে দিলে একেবারে কেঁদে' বলি নে। 'সে প'ড়ে সবার আছে পিছনে' কিংবা 'রেখে চালাকি দাও তোমার' হবার জো নেই। তার কারণ জোড়া ক্রিয়ার জোড় ভাঙা অবৈধ।

চলতি গদ্যের একটা নমুনা দেওয়া যাক। এতে সাধু গদ্যভাষার বাক্যপদ্ধতি অনেকটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে—

কুঞ্জবাবু চললেন মথুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরুনের পাল্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মের্‌জাই গায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঘর সামলাবার জন্যে রয়ে গেছে ভরু সর্দার। টৌমি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেণ্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে শোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ডাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বুঝি দেখা গেল সিগ্ন্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পাল্কি নামালো অশথ-তলায়। হঠাৎ একটি ভিখিরি মেয়ে ছুটে এসে বললে, 'দরজা খোলো মা, একবার মুখখানি দেখে নিই।' দরজা খুলে চমকে উঠলেন গিন্নিঠাকরুন, 'ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!' কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে দুই পা তুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, তার পরেই ওকে সরিয়ে দিল, জোরে ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সন্ধানে ছুটল লোকজন। বড়োবাবু স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন 'বিনু বিনু', মিলল না কোনো সাড়া। মুকুন্দ রইল তার সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িতে, রুমালে মুখ লুকিয়ে একেবারে চুপ। মেলগাড়ি কখন্‌ গেল বেরিয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই।

২৩

আমাদের দেহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীরযন্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধি-প্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার ক'রে চলতে হয় না।

আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস— তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষা-রঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্যে বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহুলক্ষ তারা-চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন, আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিম্নে তা উদ্‌ধৃত করে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।—

আমার পক্ষে যা সবচেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাশ করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শরীরবিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে— মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা 'হায় কৃষ্টি' 'হায় কৃষ্টি' ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শারীরতত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তা হলেই ধন্য হব। ১৬।১১।৩৮

